গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক ও বঙ্গীয়-গ্রন্থাগার-পরিষদ্-পরিচালিত
গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ-কেন্দ্রের অধ্যাপক
শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় এম্-এ, বি-টি, ডিপ্-লিব্,
কাব্যব্যাকরণতীর্থ প্রণীত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা—১২।

৩৩নং হজুরীমল লেন, কলিকাতা—১৪
হইতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে
শ্রীফণিভূষণ রায় এম্-এ, ডিপ্-লিব্ কর্তৃক প্রকাশিত;
ও
১১৯নং তারক প্রামাণিক রোডস্থ
"চণ্ডিকা প্রেস" হইতে
শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

নিম্নলিখিত স্থানসমূহে ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য :—

১। গ্রন্থকারের নিকট

২। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ কার্যালয়
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কিংবা
[সন্ধ্যায়] ৩৩ নং হজুরীমল লেন, বহুবাজার, কলিকাত।

৩। শরৎ পুস্তকালয়
৩ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৪। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

৫। দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রথম প্রকাশ :: ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৬

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র

—উৎসর্গপত্র—

সমস্যা-জর্জরিত পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত রূপের
পশ্চাতে আগামী দিনের গৌরবোজ্জ্বল মূর্তিকে যিনি
অহরহঃ মানস-নয়নে প্রত্যক্ষ করিতেছেন,
অবিরাম কর্ম-সাধনায় যিনি আপনার
ধ্যানকে বস্তুজগতে প্রতিষ্ঠিত
করিতে কৃতসংকল্প, বাঙালী
জাতির সেই মহান্
নায়ক

ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায়ের

করকমলে
এই অকিঞ্চিৎকর পুস্তকার্য্য
পরমশ্রদ্ধাভরে
সমর্পিত হইল।

ভূমিকা

বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বই প্রকাশ করতে হ'লে কোন কৈফিয়তের দরকার করে না। আমাদের দেশের সহর-পল্লী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলো যাঁদের নিঃস্বার্থ সেবার উপর নির্ভর ক'রে বেঁচে আছে, তাঁদের শিক্ষার মান ও মাধ্যম বিচিত্র। তাই বিদেশী ভাষায় লেখা ভাল বই দিয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটে না। তা' ছাড়া বিদেশী বইগুলো প্রধানতঃ ইউরোপ-আমেরিকার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার-সমস্যা অবলম্বন ক'রেই রচিত। আমাদের দেশের সমস্যা নিয়ে কি স্বদেশী কি বিদেশী কোন ভাষায়ই এখনও খুব বেশী বই লেখা হয় নি'। বস্তুতঃ ১৯৫২ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু মহাশয় যখন আমাকে পরিষদ্-পরিচালিত শিক্ষণ-বিভাগে গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণ (Library Extension) বিষয়ে অধ্যাপনার দায়িত্ব দেন, তখন বইয়ের অভাব আমি তীব্রভাবে অনুভব করি। তখনই অধ্যাপনার তাগিদে আমাকে এই পুস্তকে আলোচিত কয়েকটি পরিচ্ছেদের উপকরণ সংগ্রহ ক'রতে হয়। তারপর শুভানুধ্যায়ী বন্ধু-বান্ধবদের উৎসাহে ও আগ্রহে এই বইখানা প্রকাশ করতে প্রবৃত্ত হই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার-বিষয়ক নানাবিধ পরিকল্পনা এই সময়ে কার্যকরী হ'তে আরম্ভ করে। এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত ক'রতে গেলে স্বভাবতঃই নতুন নতুন সমস্যা ও প্রশ্নের উদয় হবে। আমার আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই সমস্যাগুলোর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকায় এই গ্রন্থে এদের সম্বন্ধেও আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ ক'রেছি। গ্রন্থাগার-কর্মী ও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-পাঠার্থীরা এই বই থেকে সামান্য উপকার পেলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হ'য়েছে ব'লে মনে করব।

এই বই প্রকাশে আমায় নানাভাবে সাহায্য ক'রেছেন আমার সহ-কর্মী শ্রীঅমিয়ভূষণ রায় বি-এ, ডিপ্-লিব্, মুদ্রণ বিষয়ে সাহায্য ক'রেছেন শরৎ পুস্তকালয়ের স্বত্বাধিকারী শ্রীপ্রণবকুমার সাহা, প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন ডাঃ শ্রীশান্তিরঞ্জন দাসগুপ্ত এম্-এ (লণ্ডন), পি-এইচ্-ডি (হার্বার্ড)। দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা পরিচ্ছেদের উপকরণের জন্য আমি ঐ গ্রন্থাগারের পরিচালক শ্রীদেশরাজ কালিয়া এম্-এ, এল্-এল্-বি, ডিপ্-লিব্ মহাশয়ের নিকট ঋণী। 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার-বিষয়ক পরিকল্পনা' অংশ রচনায় আমায় বিশেষভাবে সাহায্য ক'রেছেন পশ্চিমবঙ্গের বয়স্ক-শিক্ষা-প্রাধিকারিক শ্রীমন্মথনাথ রায় এম্-এ, বি-টি। আমি সানন্দে এঁদের কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। ভাষার সংস্কার ও প্রুফ্ দেখার জন্য আমি যাঁর কাছে ঋণী, তিনি আমাকে তাঁর নাম প্রকাশের অনুমতি দেন নি'।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্তৃপক্ষ এই বইখানাকে পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশ ক'রতে সম্মত হ'য়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ক'রেছেন।

আমার সব চেয়ে সন্তোষ এই যে পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত উন্নতিকর কার্যের মূলে যিনি অধিষ্ঠিত, সেই মহামান্য মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় আমার এই সামান্য গ্রন্থখানা তাঁর নামে উৎসর্গ করবার অনুমতি দিয়েছেন। তাঁরই নির্দেশে অনুসৃত গ্রন্থাগার-পরিকল্পনার নানা দিক্ সম্বন্ধে আমার এই সামান্য আলোচনাকে তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত করবার সুযোগ দিয়ে তিনি আমাকে যে উৎসাহ দিয়েছেন, তার জন্য তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য।

"স্থবিরস্থ ভবন"
২নং রামগোপাল স্থবিরস্থ লেন,
হাওড়া, ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৫৬। } শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা

উপক্রমণিকা

যে কোন সমাজকে বেঁচে থাক্‌তে হ'লে তার অন্তর্ভুক্ত লোকদের জীবিকার সংস্থান থাকা যেমন প্রয়োজন তেমনই প্রয়োজন সমাজভুক্ত লোকদের পরস্পরের মধ্যে এমন একটা সম্বন্ধ গ'ড়ে তোলা যাতে একে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে, কিংবা একে অন্যের শ্রীবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি না করে। অর্থাৎ নিজে বাঁচ আর অপরকে বাঁচ্‌তে দাও—এই হচ্ছে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থার মূল কথা। তাই সামাজিক মানুষকে জীবিকা অর্জনের পন্থা শেখান আর তার ভেতর প্রাথমিক নীতিজ্ঞান সঞ্চার করা—এই হ'ল সমাজের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজকে নানা ভাবে, নানা পন্থায় এই দুটো কাজই ক'রতে হ'য়েছে।

আমাদের দেশে সমাজ একদা বেঁচে ছিল প্রধানতঃ ধর্মকে আশ্রয় ক'রে। বর্ণাশ্রম-ধর্মের কাঠামোর মধ্যেই এই উভয়বিধ শিক্ষার বীজ নিহিত ছিল। সেকালে প্রত্যেক শিশুকে তার পৈতৃক বৃত্তি শিখ্‌তে হ'ত—শুধুমাত্র জীবিকার উপায় ব'লে নয়—ধর্মসাধনের উপায় ব'লেও। ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ও শান্তিরক্ষা, বৈশ্যের পক্ষে কৃষি ও বাণিজ্য, শূদ্রের পক্ষে সেবা—শুধুমাত্র জীবিকার্জনের পন্থাই ছিল না—ছিল ধর্মলাভেরও উপায়। তা'ছাড়া সমস্ত জীবনটাই প্রতিষ্ঠিত ছিল গার্হস্থ্য ধর্মের উপর—যার সর্বাংশ জুড়ে থাকত অহিংসা, অতিথিপরায়ণতা, আত্মত্যাগ, ষড়্‌রিপুনিগ্রহ প্রভৃতির শিক্ষা। সুতরাং আমাদের দেশে যতদিন বর্ণাশ্রম বেঁচে ছিল,

ততদিন সাধারণ সমাজশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব সেই বর্ণাশ্রমধর্মই গ্রহণ ক'রেছিল ; তার জন্য আর পৃথক্ কোন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন ছিল না।

বর্ণাশ্রমের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজ-ব্যবস্থায় লোকশিক্ষার আয়োজনও ছিল প্রচুর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিয়ে থাকতে বাধ্য ছিলেন ব'লে তাঁকে লেখাপড়া শিখতেই হ'ত। ব্রাহ্মণ ছাড়া বিপুল জনসমাজের অধিকাংশ লোকের কিন্তু লেখাপড়ার কোন ধারই ধারতে হ'ত না। জীবিকা তাঁদের ছিল এমন যে লেখাপড়ার সঙ্গে তার এমন কিছু ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তা'ছাড়া নৈতিক জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন ছিল সৎ আচরণের, গভীর পাণ্ডিত্যের নয়। সুতরাং লেখাপড়ার খুব বেশী ধার সমাজের বেশীর ভাগ লোকেরই ধারতে হ'ত না। কিন্তু শিক্ষা আর লেখাপড়া এক কথা নয়। অক্ষর পর্যন্ত না চিনেও সেকালে আমাদের দেশের লোক সমস্ত পুরাণ ইতিহাসের খবর রাখ্‌ত। তারা জানত ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও আদর্শের কথা। দর্শনের অনেক গূঢ় তত্ত্বও তাদের অজ্ঞাত ছিল না। জীবনের উদ্দেশ্য ও মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধেও তাদের জ্ঞান ছিল সুস্পষ্ট।

লেখাপড়া ছাড়া, তাত্ত্বিক আলোচনার সাহায্য ছাড়া একটা জাতের আপামর জনসাধারণ কেমন ক'রে এত সব কঠিন কঠিন কথা জানত— এ ভাবলে আশ্চর্য হ'য়ে যেতে হয়। কিন্তু তখনকার লোকশিক্ষার আয়োজনের কথা মনে রাখলে আমাদের আর বিস্মিত হবার কারণ থাকে না। প্রথমেই বলা হ'য়েছে সমস্ত জীবন ও সমাজটা ধর্মের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে ছিল ব'লে নীতিগুলো মেনে চলা ও জানা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল। সকলকেই ঐসব নীতি মেনে চ'লতে হ'ত বা মেনে চলার চেষ্টা ক'রতে হ'ত। এতে নীতিজ্ঞান যেটুকু জন্মাত তাকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলা হ'ত কথকতা, যাত্রা, পাঁচালী প্রভৃতির সাহায্যে। কথক অনবদ্য ভঙ্গীতে—কোথায়ও ভক্তিগদগদ কণ্ঠে, কোথায়ও সহজ সরল ভাবে, কোথায়ও বা রসগর্ভ ব্যঙ্গের সাহায্যে—ধর্ম ও ন্যায়ের প্রতি সম্মান এবং

অধর্ম ও অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি ক'রতেন সাধারণের মনে। তিনি পুরাণ ইতিহাসের যে সমস্ত কাহিনী তাঁর বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট ক'রে তোল্‌বার জন্য উদাহরণ হিসাবে ব'ল্‌তেন তা' জনসাধারণ গ্রহণ কর্‌তে চেষ্টা ক'র্‌ত, পাঠশালার বিদ্যার্থীর মত স্মৃতিশক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে নয়, আপনাদের হাসি, কান্না, ঘৃণা, সহানুভূতি দিয়ে। কবির গান সেদিন পর্যন্ত আমাদের দেশে বেঁচে ছিল। আমাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলোর অসাধারণ স্থলগুলোকে জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত ক'রে তুল্‌তে এর অবদান কখনই অস্বীকার করা যাবে না। অথচ এই সব পৌরাণিক কাহিনী যারা শিখেছিল তারা অক্ষর পর্যন্তও জান্‌ত না। এর চেয়েও আশ্চর্য কথা আছে। বাঙালীর কাব্য কি সংখ্যার দিক্ থেকে, কি কলাগৌরবের দিক্ থেকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর নয়। অথচ যাঁদের রস আস্বাদন করানোর জন্য এই সব কাব্য রচিত হ'ত তাঁদের অধিকাংশই লেখাপড়া জান্‌তেন না। সুতরাং তাঁদের শেখানোর জন্য এই সব শোনাবার বিপুল বন্দোবস্ত ছিল। শিক্ষিত অশিক্ষিতের দুয়ারে এগিয়ে আস্‌তেন আপনার রচনার সম্ভার নিয়ে—নিজ-হাতে পরিবেশন ক'র্‌তেন তাঁদের কাছে আপনার রচনামৃত—আপনিও সৃষ্টির সার্থকতা অনুভব ক'র্‌তেন—সাধারণকেও দিতেন শিক্ষা। বস্তুতঃ জনশিক্ষার এই আয়োজন ছিল ব'লেই আমাদের সমাজে ধর্ম নিম্নতম স্তরে পর্যন্ত প্রবেশ লাভ ক'র্‌তে পেরেছিল।

বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে কিন্তু আমাদের এই পুরাতন ব্যবস্থা-গুলোকে আমরা বাঁচিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লুম না। বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ ক'রে ব'লেছেন—আমাদের দেশের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের যোগসূত্র ছিন্ন হ'য়ে গেছে। রামা কৈবর্তের দুঃখ বা সুখ, ভাল বা মন্দ আজ আর হরিবাবুর জীবনে কোনই দাগ কাট্‌তে পারে না। তার ফলে আমাদের সমাজ-জীবনে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। ধর্মের বাঁধন শিথিল হ'য়ে প'ড়েছে। নীতি-না-মানার অপরাধ অনেক লঘু হ'য়ে উঠেছে। সমাজ-প্রাধান্য ঘুচে যেয়ে ব্যক্তি

প্রাধান্যের আবির্ভাব ঘটেছে। সমাজের মঙ্গল ব্যক্তির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে গৌণ হ'য়ে উঠেছে। ফলে সমাজ-রক্ষার ভার ব্রাহ্মণের হাত থেকে পুলিশের হাতে গিয়ে পৌঁচেছে।

বিদেশী শাসনের মন্দ দিক্‌টা নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, কেন না এটা অত্যন্ত স্পষ্ট। কিন্তু এর একটা ভাল দিক্‌ও যে না ছিল তা' নয়। পূর্বে শিক্ষার দ্বার ছিল শ্রোত্র। বিদেশী সভ্যতার সংস্পর্শে এসে আমরা চক্ষুকে জ্ঞানের দ্বার ব'লে নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'র্‌লুম। বৈদিক যুগে সমস্ত বেদই শুনে মুখস্থ ক'রে ফেলা হ'ত ব'লে বেদের এক নাম শ্রুতি। কোষ, অভিধান সবই মুখস্থ করার রেওয়াজ ছিল। বড় বড় পণ্ডিত অনেক সময় ভাল লিখ্‌তে পর্যন্ত পারতেন না, পুঁথি নকল ছিল অপণ্ডিত এবং স্ত্রীলোকদের জীবিকা। বলা হ'ত "আবৃত্তিঃ সর্ব্ব-শাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী"। সুতরাং শিক্ষার দ্বার যে ছিল প্রধানতঃ মুখ ও কান এ কথা খুবই সঙ্গতভাবে বলা চলে। স্বীকার করি বৌদ্ধ যুগে চোখের মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা হ'য়েছিল। মুসলমানী আমলে মামুদ গাওয়ান দাক্ষিণাত্যে গ্রন্থাগারের প্রসারের চেষ্টা ক'রেছিলেন। মোগল বাদ্‌শাদের একাধিক কৃতবিদ্য ছিলেন। ব্রাহ্মণ-মৌলবীরা নিত্য ধর্মগ্রন্থ পাঠ ক'র্‌তেন। তবুও জনসাধারণের মধ্যে চক্ষুর মাধ্যমে শিক্ষার্জনের প্রথা যে প্রাক্‌-ইংরেজ যুগে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রচলিত ছিল না, একথা বোধ হয় মোটামুটি স্বীকার ক'রে নেওয়া যায়।

শিক্ষায় চক্ষুর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগের সূত্রপাত হ'ল। সব চেয়ে যুগান্তকারী ঘটনা যা এর ফলে ঘট্‌ল তা' হ'চ্ছে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা। শ্রোত্র-কেন্দ্রিক শিক্ষার যুগে শিক্ষার্থীকে জ্ঞানমাত্রের জন্য গুরুমুখাপেক্ষী হ'য়ে থাক্‌তে হ'ত। গুরুর অবসর বা অবকাশকাল ব্যতীত অন্য সময় শিক্ষা গ্রহণের কোনরকম সুযোগ সুবিধা ছিল না। যদি শিক্ষার্থী গুরুর অবসর সময়ে নিজের অবকাশ ক'রে নিতে

না পার্‌ত তা' হ'লে তার শিক্ষালাভের পথ হ'ত অত্যন্ত সঙ্কুচিত। অবশ্য প্রাক্-ইংরেজ যুগে আমাদের দেশে জীবনযাপন-প্রণালী এত সহজ, অনাড়ম্বর আর বাঁধা-খাতে-ধরা ছিল যে এরকম সমস্যা তখন উঠ্‌তই না। কিন্তু ইংরেজ আমলে, শিল্প প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে নতুন মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, ব্যবসা ক্ষেত্রে নতুন নতুন জটিলতার উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে, জীবন হ'য়ে প'ড়্‌ল সংগ্রামময়। মানুষের অবসর আর কাজের বাঁধা-সময়ের পুরানো নিয়ম অচল হ'য়ে প'ড়্‌ল। জীবিকার জন্য প্রাচীন কুলক্রমাগত শিক্ষা অকার্যকর প্রতিপন্ন হ'তে লাগ্‌ল। প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থাই উল্‌টে পাল্‌টে একেবারে নতুন হ'য়ে দেখা দিল। ফলে আর আগেকার শিক্ষার ধারায় আমাদের কাজ চ'ল্‌ল না। শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

আজকের মানুষকে জীবিকার জন্য নতুন ক'রে শিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। চাষী পিতৃপিতামহের প্রথা অবলম্বন ক'রে চাষ ক'রলে আজ আর চ'ল্‌বে না। জনসংখ্যা বেড়ে গেছে—জমির পরিমাণ গেছে ক'মে, সুতরাং কম জমিতে বেশী ফসল ফলানোর জন্য আজ তাকে নতুন পন্থা অবলম্বন ক'র্‌তে হবে। জান্‌তে হবে কৃষিবিজ্ঞানের নবাবিষ্কৃত ফলপ্রদ পন্থা। ব্যবসায়ীকে, আজ পণ্যের জন্য বিশ্বসংসারের দূরতম স্থানটিরও সন্ধান রাখ্‌তে হবে, বিভিন্ন পণ্যবাহী প্রতিষ্ঠানের খবর রাখ্‌তে হবে, দৈনন্দিন দরের পরিবর্তন লক্ষ্য ক'র্‌তে হবে। কেননা আজ ক্রেতার সাম্‌নে আপনার পণ্য উপস্থিত ক'রে যারা জীবিকা অর্জন ক'র্‌তে চায় তাদের সংখ্যা আগের চেয়ে শুধু অনেক বেশীই নয়—তারা এই সব সন্ধান জেনে আপনার পণ্যকে সব চেয়ে সস্তায় দিতেও সক্ষম। শিল্পীকে আজ খবর রাখ্‌তে হবে তার নিজের শিল্পের উন্নতির জন্য জগতে কোথায় কতটা অগ্রগতি হ'য়েছে—কেননা ঐ জ্ঞান আজ সহজলভ্য হওয়ায় ঐ জ্ঞানের অস্ত্র হাতে নিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য প্রস্তুত বহুলোক আজ জীবন-

রূপক্ষেত্রে উপস্থিত হ'য়েছে। ফল কথা, আমাদের জীবিকা-অর্জন ব্যাপারটি আজ বেশ জটিল হ'য়ে উঠেছে। কুশল কর্মী ব্যতীত আজ আর কারুর অতি সহজে এই কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। শিক্ষাই মাত্র ঐ কৌশল অর্জনে সাহায্য ক'র্তে পারে। তাই প্রতি ব্যক্তিকে জীবিকা অর্জনের জন্ম আজ শিক্ষালাভ ক'র্তেই হবে।

ধর্ম, পুনর্জন্ম প্রভৃতিতে আজ যে জন্মই হোক্ মানুষের আস্থা অনেক কমে গেছে। যে বিশ্বাস—শিখণ্ডী ক্লীব ছিল বলে তার দ্বারা নিহত হওয়া তাকে আঘাত করার চেয়ে কল্যাণকর মনে করেছে—সে বিশ্বাসের স্থান নিয়েছে আজ হিরোসিমা-নাগাসাকীর যেন-তেন-প্রকারেণ যুদ্ধজয়ের দর্শন। স্ত্রী, শিশু, রুগ্ন, বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলকে নির্বিচারে হত্যা ক'রেও ইহকাল-সর্বস্ব মানুষের কাছে, যোদ্ধারা বিজয়ীর ও বীরের সম্মান দাবী করে ও পায়। সুতরাং কি ব্যক্তি হিসাবে, কি জাতি হিসাবে ইহকাল-সর্বস্ব মানুষের আত্মসুখের প্রবল স্পৃহাকে সংযত করা আজ একান্ত প্রয়োজন হয়ে প'ড়েছে। তাই প্রতি রাষ্ট্রে নতুন নতুন আইন তৈরী হচ্ছে—আন্তর্জাতিক আইনও বিধিবদ্ধ হচ্ছে। মানুষকে এইগুলো আজ মানতেই হবে—পরলোকে শাস্তির ভয়ে নয়, সমাজের নিন্দার ভয়ে নয়—ইহকালেই দণ্ডের আশঙ্কায়। তাই মানুষকে জান্তেও হবে এগুলো। সুতরাং রাষ্ট্রিয় আইন,—যেগুলো আগে ছিল সংখ্যায় অনেক কম, যেগুলো আগে কষ্ট ক'রে শিখ্তে হ'ত না, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই পালিত হ'ত—সেইগুলোও আজ নতুন ক'রে শিখ্তে হবে।

প্রায় প্রত্যেক দেশেই আজ জনসাধারণের কল্যাণ-রাষ্ট্র স্থাপিত হ'তে চ'লেছে। অর্থাৎ আজকের রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য দুষ্টের দমন মাত্র নয়, শিষ্টের পালন ও জনসাধারণের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে সাহায্য করা। এই জন্ম সব রাষ্ট্রই জনসাধারণের জন্ম কিছু কিছু মঙ্গলকর কাজ ক'র্তে উদ্যোগী হ'য়ে থাকে। জনসাধারণের পক্ষে প্রয়োজন এই সব ব্যবস্থার খোঁজ রেখে

এগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা করা। তাই জন-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রের নানা কাজের খোঁজ রাখাও আজ প্রয়োজন হয়ে প'ড়েছে।

উপরের এই আলোচনায় অবশ্য-শিক্ষণীয় বিষয়গুলো আগের চেয়ে কত বেড়ে গেছে তা' সংক্ষেপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা গেল। শিক্ষণীয় বিষয় যেমন অনেক বেড়েছে, তেম্‌নি শ্রোত্র-কেন্দ্রিক শিক্ষার জায়গায় আজ চক্ষুঃ-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শিক্ষায় স্বাধীনতা এসেছে, শিক্ষার্থীর সুযোগ বেড়েছে—এও দেখানো হ'য়েছে। বলা বাহুল্য, এই চক্ষুঃ-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে, এই শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার মধ্যেই গ্রন্থাগারের জন্ম। বস্তুতঃ স্বাধীন জ্ঞানার্জনের জন্য পাঠকরা যেখানে গ্রন্থ-ব্যবহার করার সুযোগ পায় তাই হ'ল গ্রন্থাগার। জ্ঞানের জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য আজ গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার প্রধানতম বাহন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লোকশিক্ষার জন্য গ্রন্থাগারের যে দায়িত্ব তা গ্রন্থাগার কেমন করে পালন কর্‌তে পারে এটা আজ ভাব্‌বার কথা। এই সমস্যার নানা দিক্‌ আছে। কিন্তু আমাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের সমস্যা গ্রন্থাগার কেমন ক'রে সমাধান কর্‌তে পারে এই সমস্যাই সব চেয়ে বড় সমস্যা। আমাদের দেশের বিপুল জনসাধারণ এখনও অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত। অথচ জীবন-সংগ্রামে তাদের সাফল্যের উপরই জাতির বাঁচা মরা নির্ভর কর্‌ছে। এই বিপুল জনসমাজকে জ্ঞানার্জনে আত্মনির্ভর করার প্রয়োজন কেউই অস্বীকার কর্‌তে পারে না—কিন্তু এই আত্মনির্ভরতা অর্জনের পর যদি তাদের শিক্ষার কাজ আরম্ভ কর্‌তে হয় তবে সেই আরম্ভ করার কাজেই যে কত দেরী হবে তা ভাব্‌লে উৎকণ্ঠিত হ'তে হয়। তা' ছাড়াও এর সঙ্গে যথাযোগ্য পুস্তক প্রভৃতির মত আরও অনেক অসুবিধা জড়িয়ে আছে। সেগুলো দুরতিক্রম্য না হ'লেও সেগুলো দূর কর্‌তে সময় ও অর্থের দরকার। তার পরের কথা স্বাধীনতার ব্যবহারও অভ্যাস-সাপেক্ষ। যদি পরনির্ভরতা

কারুর মজ্জাগত হয়ে যেয়ে থাকে তবে তাকে ধীরে ধীরে স্বাধীন ভাবে বিচরণের অভ্যাস আয়ত্ত না করিয়ে, একেবারে স্বাধীনতার মধ্যে ছেড়ে দিলে অনেক ক্ষেত্রেই অসহায় ও বিভ্রান্ত করা হবে। শেষ কথা জ্ঞানার্জনের পক্ষে অন্য জ্ঞানীর সাহায্য যে অনেক ক্ষেত্রেই অভীষ্টলাভকে সুগম করে একথাও অনস্বীকার্য। তাই গ্রন্থাগারে পাঠকের স্বাধীন-পাঠের সঙ্গে সঙ্গে তার জ্ঞানলাভের জন্য কর্ণেন্দ্রিয়েরও সাহায্য নেওয়া দরকার কিনা একথা আমাদের ভাবা দরকার। বস্তুতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে যেমন প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ আর স্বকীয় চিন্তার বিকাশ সাধন এই দুটোকেই শিক্ষার উদ্দেশ্য মনে করা হয়, তেমনই গ্রন্থাগারেও জ্ঞান-দানের আর জ্ঞান-অর্জনের উভয় ব্যবস্থা থাকাই উচিত বলে মনে হয়।

গ্রন্থাগার অনেক ক্ষেত্রেই কিন্তু নিজের উদ্দেশ্য সফল কর্‌তে পারে না। একে ত' আমাদের দেশের বিপুল সংখ্যক লোক অক্ষরজ্ঞান-বর্জিত বলে তাদের গ্রন্থাগারে আস্‌বার অধিকারই নেই, তার উপর আমাদের দেশের গ্রন্থাগার এখনও জ্ঞান-অর্জনের কেন্দ্র হয়ে ওঠেনি—এখনও এ মানুষের অবসর বিনোদনের সহায়ক মাত্র। তাই সঙ্কুচিত ক্ষেত্রের মধ্যেও গ্রন্থাগার নিজেকে ঠিক্ সার্থক করে তুল্‌ছে কিনা সন্দেহ। তার উপর যে সব লোকের অবসর কম—তারা গ্রন্থাগারে যেতেও পারে না, যায়ও না। যেতে পারে না. অবসরের অভাবে—যায় না, যেয়ে লাভ নেই বলে। কী লাভ হবে তাদের কতকগুলো কল্পিত কাহিনী প'ড়ে সময় নষ্ট ক'রে—যে সময় তারা কাজ ক'রে, জ্ঞান-অর্জন ক'রে সার্থক করে তুল্‌তে পারে? বেচারী গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষই বা করে কী? পাঠকের বিপুল সংখ্যকের চাহিদা যেখানে হ'চ্ছে গল্পের বইয়ের, সেখানে সে বেচারী দুই একজন কাজের লোকের দিকে চেয়ে তার সামান্য সঙ্গতি ব্যয় ক'রতে পারে কি? আবার গল্পের বই বা কাহিনী পাঠও ত' অন্যায় কিছু নয়। চরিত্র গঠনের দিক দিয়ে, অল্প খরচে অবসর বিনোদনের দ্বারা

মানুষের মনকে ক্ষতিকর চিন্তা থেকে মুক্ত করার দিক্ দিয়ে বিবেচনা ক'র্‌লে গল্পের বই পড়া অবাঞ্ছনীয় ব'লে কখনই মনে হ'তে পারে না। কিন্তু তবুও লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার প্রধানতঃ কাহিনীর বই সরবরাহ নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেননা কাহিনীর বই-এর উপকারিতা যতই থাক্ না কেন, গৌণভাবে এ যতই শিক্ষাপ্রদ হোক্ না কেন, লোকশিক্ষার সঙ্গে এর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ খুব কম। তাই লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে সাধারণ গ্রন্থাগারের যা' কাজ তা' ক'র্‌তেই হবে, তার সঙ্গে সঙ্গে তাকে পাঠকের জ্ঞানলাভের ইচ্ছাকে জাগ্রত ক'রে তুল্‌তে হবে। সাধারণ গ্রন্থাগার পাঠকের জন্য আপনার দ্রব্য-সম্ভার সাজিয়ে নিয়ে অপেক্ষা ক'র্‌বে—পাঠক এলে তার পরিপূর্ণ সন্তোষ বিধানের চেষ্টা ক'র্‌বে। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার আপন সম্ভার সাজিয়ে নিয়ে পাঠকের দুয়ারে হাজির হবে। তার রুচির সৃষ্টি ক'রে তার কাছে আপনার জিনিষ কাটাবার চেষ্টা ক'র্‌বে। সাধারণ গ্রন্থাগার যদি মনিহারী দোকানের মত হয়—লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার হবে সওদার ঠেলাগাড়ী। এর সাজানো গোছানো রূপ আর রোজ রোজ যাওয়া আসা দেখে নতুন লোকও যদি জিনিষ কিন্‌তে আকৃষ্ট হয় তবেই এর সার্থকতা।

বস্তুতঃ আপনার নিয়ম-মাফিক বাঁধাধরা কাজ ক'রেও নতুন পাঠক সৃষ্টি করা, পুরান পাঠকদের মধ্যে লাভজনক পাঠের রুচি সৃষ্টি করা—একেই আজকাল গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণ-কার্য ব'লে বলা হয়। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের এই গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণ-কার্য্যে পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের কাজ লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের সাফল্যের সঙ্গে এতই ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ যে, কার্যতঃ লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কাজের মধ্যে নিবদ্ধ ব'ল্‌লে খুব ভুল বলা হবে না।

এই সম্প্রসারণের পথে সাফল্য অর্জন ক'র্‌তে হ'লে সাধারণ গ্রন্থাগারের

পক্ষে কতকগুলি সর্ত্ত পূরণ করা প্রথমতঃ প্রয়োজন। সবচেয়ে আগে দরকার গ্রন্থাগারের পুস্তকসংগ্রহে বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য। একথা ঠিক্ যে বেশীর ভাগ লোক প্রায়শঃ একই বইয়ের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তাই প'ড়ে থাকে। তবুও মানুষের বৃত্তি, রুচি, সামাজিক পরিবেশ প্রভৃতি ভেদে প্রয়োজন হয় ভিন্ন ভিন্ন। আর এই প্রয়োজনের বিভিন্নতার জন্যই মানুষকে নতুন ক'রে চেষ্টা ক'রে জ্ঞানার্জন ক'র্‌তে হয়। তাই গ্রন্থাগার পাঠক-সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করার আগে বিভিন্ন বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহের জন্য যত্নবান্ হবে। পুস্তক-সংগ্রহে বৈচিত্র্য না থাক্‌লে, নতুন পাঠককে নতুন জ্ঞান আহরণের সুযোগ দিতে না পার্‌লে গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণের কাজ সফল হ'তে পারে না। তা'ছাড়া প্রত্যেক গ্রন্থাগারের বইএর সংগ্রহ আধুনিক ক'র্‌তে হবে। আমাদের অনেক বই আছে—হয়ত পাঠক-সংখ্যার অনুপাতে বইগুলো যথেষ্ট। কিন্তু তবুও মনে রাখ্‌তে হবে, যে স্বল্প সংখ্যক পাঠক বই প'ড়বে তারা কখনই পুরান বইগুলো নিয়ে তৃপ্ত থাক্‌তে পারবে না, সুতরাং সম্প্রসারণ কাজে সাফল্যের প্রথম সর্ত্ত হ'চ্ছে গ্রন্থাগারের ভাল পুস্তক-সংগ্রহ।

দ্বিতীয় মূল সর্ত্ত হ'চ্ছে গ্রন্থাগারের সেবা-প্রবৃত্তি। মনে রাখ্‌তে হবে, অধিকাংশ লোক কোন্ বইয়ে তার অভীষ্ট খবরটি পাবে তার খোঁজই রাখে না। অনেকে বড় বই থেকে কেমন ক'রে ঠিক যে জায়গায় প্রয়োজনীয় খবর পাওয়া যাবে সেটা খুঁজে নিতে পারে না। অনেকের হয়ত নিজে থেকে খবরটা খুঁজে বের করার সামর্থ্য বা সময় কোনটাই নেই। গ্রন্থাগারকে এই শ্রেণীর সকলকে প্রয়োজনীয় খবর খুঁজে দেবার জন্য প্রস্তুত থাক্‌তে হবে। যত তুচ্ছ কিংবা যত কঠিন সংবাদের জন্যই কেউ গ্রন্থাগারে আসুক না কেন, সে এসে তার সেবা করবার সুযোগ দিয়ে যে আমাদের ধন্য ক'রেছে এই রকম একটা ভাব তার কাছে প্রকাশ করা দরকার। গ্রন্থাগার সেবা ক'রেছে এইটেই বড় কথা নয়—যে গ্রন্থাগারের সেবা নিল,

সে কি গ্রন্থাগার থেকে সসঙ্কোচে ফিরে গেল, নিজেকে ছোট বোধ ক'রে গেল, না সে গ্রন্থাগারের সেবায় আপ্যায়িত আনন্দিত হ'য়ে গেল এইটেই বড় কথা। যে গ্রন্থগার সেবা-পরায়ণতায় বিমুখ সে কখনও আরও পাঠককে আকর্ষণ ক'র্তে পারবে না—কখনও সম্প্রসারণ-কার্যে সাফল্য লাভ ক'র্তে পারবে না।

সম্প্রসারণ কাজের সাফল্যের সবচেয়ে প্রধান কথা হ'চ্ছে গ্রন্থাগার পরিচালনার ক্রটিহীন ব্যবস্থা। পাঠককে গ্রন্থাগারে ডেকে এনে যদি তাকে হতাশ করা হয়, তার চেয়ে দুঃখের, লজ্জার বা অখ্যাতির কথা আর কিছু নেই। নেমন্তন্ন ক'রে লোককে তৃপ্ত করে খাওয়ালে খ্যাতি হয়, কিন্তু নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াতে না পারলে সে খ্যাতি হয় কি? ভাল লোকরা হয়ত অক্ষমতাকে উপেক্ষা ক'র্বেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক ক'র্বে উপহাস। তাই গ্রন্থাগারের বইয়ের শ্রেণীবিভাগ থেকে বই দেওয়া পর্যন্ত, সংবাদ-সরবরাহ থেকে বই বেছে নেবার কাজে সাহায্য করা পর্যান্ত সব কিছুর ভাল ব্যবস্থা ক'র্তে পারার আগে নতুন পাঠক সংগ্রহের চেষ্টা না করাই ভাল। যারা কখনও গ্রন্থাগারের সংস্পর্শে আসে নি, তাদের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ভাল মন্দ কোন ধারণাই পোষণ করার কথা নয়। কিন্তু যারা গ্রন্থাগারে এসে যা' পাওয়া উচিত তা' পেল না, তাদের পক্ষে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া বা প্রতিকূল ধারণা পোষণ করা কি অযৌক্তিক? বস্তুতঃ খারাপ গ্রন্থাগার পাঠককে ডেকে এনে, ভাল গ্রন্থাগারেরও ক্ষতি ক'র্তে পারে।

লোকশিক্ষার সঙ্গে গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণ কাজের সম্পর্ক সম্বন্ধে এই সামান্য আলোচনা ক'রে এবং লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ কর্বার যোগ্যতার প্রধান তিনটি সর্তের উল্লেখ ক'রে, আমরা লোকশিক্ষার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের সমস্যাগুলোর আলোচনা আরম্ভ ক'র্ব।

বয়স্ক-শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে কাজ ক'র্‌তে হ'লে গ্রন্থাগারকে বয়স্ক-শিক্ষার উপযোগী ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তেই হবে—একথা বলা বাহুল্য মাত্র। সুতরাং একথা প্রতিপন্ন না ক'রে গ্রন্থাগার কেমন ক'রে বয়স্ক-শিক্ষায় সাহায্য ক'র্‌তে পারে একেবারে সরাসরি সেই আলোচনাই করা প্রয়োজন।

সব চেয়ে প্রথমে আমাদের ভাব্‌তে হবে বয়স্ক-শিক্ষা কাকে বলে। বয়স্ক-শিক্ষার শব্দতঃ অর্থ গ্রহণ ক'র্‌লে বোঝা যায় বয়স্কদের জন্য যে শিক্ষার প্রয়োজন হয় বা আয়োজন থাকে বয়স্ক-শিক্ষা ব'ল্‌তে তাকেই বোঝা যায়। কিন্তু এরকম ভাবে অর্থ ক'র্‌লে বয়স্ক-শিক্ষার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধ হবে না।

বয়স্ক-শিক্ষার তাৎপর্য অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশের পক্ষে এক নয়। অগ্রসর দেশগুলো, যারা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন ক'র্‌তে পেরেছে, তাদের দেশে এর তাৎপর্য আমাদের দেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অগ্রসর দেশগুলোতে একটা বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক অধিবাসীকেই আবশ্যিক ভাবে শিক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তেই হয়। এ শিক্ষার ব্যয়ভার থেকে সংগঠন পর্যন্ত সব কিছুরই ব্যবস্থা করে দেশের সরকার। ঐ বয়সের পর দেশের অনেক লোককেই শিক্ষার প্রশস্ত পথ ত্যাগ ক'রে জীবন-সংগ্রামের পথে চ'ল্‌তে হয়। কিন্তু অবস্থাগতিকে শিক্ষার প্রশস্ত পথ ধ'রে চলার উপায় না থাক্‌লেও এই দলের সকলেই যে শিক্ষার বিষয়ে আগ্রহ-হারা হ'য়ে থাকেন ব্যাপারটা তেমন ঘটে না। বস্তুতঃ জীবিকা সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের অনেকেই আরও শিক্ষা পাবার জন্য চেষ্টিত থাকেন।

এই শিক্ষাও আবার একজাতীয় নয়। অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার পরও চান বিদ্যালয়ের ধারারই শিক্ষা—আরও বেশী ক'রে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক

দিকগুলো জানতে হ'লে এটাই যে প্রধান পথ সে কথা অস্বীকার ক'র্‌লে হয়ত সত্যের অপলাপ করা হবে। তা'ছাড়া শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের, কিংবা সরকারী উচ্চপদলাভের অন্যতম প্রধান উপায়। তাই প্রাথমিক শিক্ষা-প্রাপ্ত জনসংখ্যার মধ্যে যারা অবস্থাগতিকে সোজাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে এগিয়ে যেতে পার্‌ল না, তারা তাদের অবসর সময়ে পড়াশুনা ক'রে তাদের উচ্চশিক্ষাকে সফল করার চেষ্টা ক'রে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় যারা তেমন আকৃষ্ট নয়, এই রকম লোকের সংখ্যাও কিন্তু এই দলে একেবারে নগণ্য নয়। তাদের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও আছে, আরও আছে তারা যে কাজ করে সে কাজে আর সকলের চেয়ে বেশী দক্ষতা অর্জনের সুগভীর অভিলাষ। সুতরাং বৃত্তিমূলক শিক্ষাও ভাল ক'রে পাবার জন্য আগ্রহ কম লোকের নেই।

এই দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া যারা নিজেদের খেয়াল খুশীমত অবসর সময় কাটায়—তারাও যা' ক'রে সময় কাটায় সেই সব বিষয়ে তাদের সঙ্গীদের চেয়ে কিংবা নিজেদেরই পূর্বাবস্থার চেয়ে বেশী যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করে। এইভাবে খেলাধূলা, মাছধরা, পাখীপোষা, বাগান-করা প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষালাভের চেষ্টাও দেখা যায়।

খবরের কাগজ পড়া এই সব অগ্রসর দেশের লোকদের অনেকেরই স্বভাব-সিদ্ধ। সুতরাং দেশ বিদেশের প্রয়োজনীয় খবর রাখার জন্য, বা রাষ্ট্রের সঙ্গে যথাযোগ্য সহযোগিতা রক্ষা করার জন্য, এদের নতুন ক'রে চেষ্টাই ক'র্‌তে হয় না। সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নীতি বা নাগরিক কর্তব্যবোধের জন্যও এসব দেশের লোককে নতুন ক'রে শিক্ষা দেবার দরকার হয় না।

উপরের সামান্য আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হবে—বয়স্করা ওদের দেশে যে শিক্ষা চায় তার প্রকৃতি কী রকম। এই শিক্ষা দেবার জন্য ওদের দেশে আছে গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়-নিয়ন্ত্রিত শিক্ষার যে

রকম ব্যবস্থাই করা যাক্ না কেন—তার উদ্দেশ্য এবং গতিপথের একটা নির্দিষ্ট সংজ্ঞা থাক্‌বেই থাক্‌বে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় প্রবেশিকা থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষা পর্যন্ত ইতিহাস শিক্ষার আয়োজন থাকে এবং প্রতি পরীক্ষার জন্য কতটা পড়া দরকার তাও নির্দিষ্ট থাকে। তাই বক্তৃতা, সান্ধ্য পাঠশালা বা পত্রের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থায়ও শিক্ষার একটা উদ্দেশ্যগত সীমা নির্দিষ্ট থাকে। ঐ ঐ ব্যবস্থায় শিক্ষা ওর বেশী আর অগ্রসর হ'তে পারে না। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার ত' কোন সীমা থাকে না। বস্তুতঃ প্রকৃত শিক্ষাকামী যারা তাদেরও শিক্ষালাভ ক'রে আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। আরও জানবার অদম্য পিপাসা থাকে ব'লেই শিক্ষা ক্রমোন্নতির অসীম পথ বেয়ে চ'লে যায় মানুষের চরম প্রাপ্তির পথ থেকে বহুদূরে। তাই শিক্ষালাভের সাধনায় কোন বিরাম নেই। তাই নিউটন জ্ঞান-সমুদ্রের উপলখণ্ডকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন না।

সুতরাং বয়স্কশিক্ষা—যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পান তাঁদের বাদ দিয়ে—অপরের জন্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁদের জ্ঞানের পথে অনেক দূর এগিয়ে দেয় এই মাত্র—জ্ঞানের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটাতে পারে না। জ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে তাই সব আয়োজন অকিঞ্চিৎকর ব'লে মনে হয় মানুষের কাছে। ব্যক্তিগত চেষ্টাই জ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন।

শিক্ষা-প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর স্বাবলম্বন যেখানে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত, জ্ঞানের উপকরণ সংগ্রহ যেখানে সীমায়িত নয়, আর্থিক অনটন যেখানে জ্ঞান-সাধনার বাধা নয়, জীবিকা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের বাধা যেখানে অনতিক্রম্য নয়, সেই জ্ঞান বিতরণের শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার যে বয়স্ক শিক্ষার প্রধানতম অবলম্বন হবে এ আর বেশী কথা কি ?

বয়স্ক শিক্ষার যে উদ্দেশ্য অগ্রসর দেশগুলোর ক্ষেত্রে বলা হ'ল, দুর্ভাগ্যক্রমে আমদের দেশে ঐগুলো এখন প্রযুক্ত হ'তে পারে না।

আমাদের দেশের অধিকাংশ বয়স্ক এখনও নিরক্ষর—তাই জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রে তারা সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী। অথচ জ্ঞান-সাধনায় স্বাবলম্বন অর্জন করা হ'চ্ছে গ্রন্থাগার ব্যবহারের যোগ্যতা লাভের প্রথম সোপান। সুতরাং বয়স্ক-শিক্ষার জন্য আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের কিছু করণীয় আছে ব'লে আপাতদৃষ্টিতে মনেই হয় না।

সহজ কথায় ব'লতে গেলে আমাদের দেশের বয়স্ক-শিক্ষার এখন প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ। কিন্তু সাক্ষর ব্যক্তি ছাড়া গ্রন্থাগার ব্যবহার করা সম্ভব ব'লেই মনে হয় না। তাই বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে, আমাদের দেশে অন্ততঃ, এখনও গ্রন্থাগারের কাজ আরম্ভ করার সময় হ'য়েছে ব'লেই অনেকের মনে হবে না।

অথচ চোখের উপর দেখ্‌ছি আমাদের দেশের সরকার বয়স্ক-শিক্ষার জন্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আয়োজন যে ক'রেছেন শুধু তাই নয়, গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে বয়স্ক-শিক্ষার আয়োজনের অংশীভূত ব'লে মনে ক'র্‌ছেন। সুতরাং আমাদের দেশের গ্রন্থাগার বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুই সাহায্য ক'র্‌তে পারে না. একথা অনেকেই যে মনে করেন না, এ ব'ল্‌লে বোধ হয় ভুল করা হবে না। সুতরাং আমাদের বুঝে দেখ্‌তে হবে গ্রন্থাগারের সঙ্গে বয়স্ক-শিক্ষার যোগাযোগ কতখানি এবং কেমন ক'রে এই যোগাযোগ রক্ষা করা যেতে পারে।

বয়স্ক-শিক্ষা—অর্থাৎ নিরক্ষরতা-দূরীকরণের কাজ সাফল্যমণ্ডিত হ'লে গ্রন্থাগার যে বহু অংশে লাভবান্ হবে একথা বলাই বাহুল্য। এখন গ্রন্থাগারের যারা নিয়মিত পাঠক এদেশে তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। দেশের অধিকাংশ লোকের অক্ষর-জ্ঞান না থাকা যে এর অন্যতম প্রধান কারণ একথা বলাই বাহুল্য। যদি দেশের সকলে প'ড়্‌তে শেখে তবে এই নতুন-প'ড়্‌তে-শেখা লোকদের মধ্যেও একদল নিশ্চয়ই গ্রন্থাগারের পাঠক-শ্রেণীভুক্ত হবে। সুতরাং গ্রন্থাগারও নিজেকে বাড়িয়ে তোল্‌বার সুযোগ পাবে। তাই নিজের

স্বার্থের খাতিরেই গ্রন্থাগারকে নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, তথা বয়স্ক-শিক্ষার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই হবে।

আমাদের দেশে বয়স্ক শিক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে পারে এমন লোকের সংখ্যা, বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে খুব বেশী নয়। গ্রন্থাগার-পরিচালনাও আমাদের দেশে এখনও স্বেচ্ছাসেবকেরই কাজ, বৃত্তি-ভোগীর কাজ হ'য়ে ওঠে নি। তাই মনে হয় গ্রন্থাগার-পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই সব লোকই আছে যারা দেশকে শিক্ষিত ক'রে তোলার কাজকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ ক'রেছে। এই সব আদর্শবাদী যুবক নিশ্চয়ই শিক্ষা সম্প্রসারণের সমস্ত পথ সম্বন্ধেই সচেতন থাক্‌বে—আর সম্প্রসারণের সব কাজেই হয় আত্মনিয়োগ, নয় অকুণ্ঠিত সাহায্য ক'র্‌বে। যদি তর্কের খাতিরে মেনেও নেওয়া হয় যে, গ্রন্থাগার-পরিচালনা আর বয়স্ক-শিক্ষার কাজ বিভিন্ন, তাদের এক ক'রে দেখা ভুল, তবুও একথা অনস্বীকার্য, যেহেতু আমাদের বিরল-কর্মীর দেশে এই দুই কাজের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কর্মী সংগ্রহ করা সহজ নয়। সুতরাং একই কর্মীকে অনেক স্থলেই দুই কাজের সঙ্গেই যুক্ত থাক্‌তে হবে। তাই কর্মীর সমস্ত কাজের সমন্বয়-সাধনের একটা স্বাভাবিক প্রয়াসও দেখা যাবে। ফলে বয়স্ক-শিক্ষা ও গ্রন্থাগার-পরিচালনা একত্র কেমন ক'রে আর কতখানি করা যায়, এ আমাদের ভেবে দেখ্‌তেই হবে।

তৃতীয়তঃ মানুষ সামাজিক জীব। তারা পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা ক'রেই থাকে। মানুষের শরীর-মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ও বৃদ্ধি বজায় রাখ্‌তে হ'লে তা'কে অবসর সময়ে সকলের সঙ্গে মেলামেশা ক'রে, খেলাধূলা ক'রে, আমোদ প্রমোদের মধ্যে কিছুটা সময় কাটাতেই হবে। তাই দেখি দেশের চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস, সহরের নানাবিধ ক্লাব, থিয়েটারের আখ্‌ড়া প্রভৃতি। কিন্তু পল্লীর সাধারণ মানুষ আজকের পরিবর্তিত আবহাওয়ায় এই সবগুলোকে আগের মত বজায় রাখতে পার্‌বে কিনা সন্দেহ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমণ্ডপগুলো প্রায় ফাঁকাই হ'য়ে

এসেছে—যাও বা কিছুটা বজায় আছে তাও জমিদারী-প্রথা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে একেবারেই ফাঁকা হবার বেশ সম্ভাবনা রয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপের জায়গা নেবার জন্য তাই নতুন প্রতিষ্ঠান জন্ম নেবেই। পল্লীর অল্প লোককে নিয়ে অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে তুলে সবগুলোকে বজায় রাখাও হয়ত সম্ভব নয়। তাই খুব সম্ভবতঃ পল্লীর লোকের মিলনকেন্দ্র এক গ্রামে একাধিক গ'ড়ে উঠ্‌বে না। কথা হ'তে পারে এর থেকে পল্লীর মিলনকেন্দ্র যে গ্রন্থাগার হবে তা' তো বোঝা গেল না। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে গ্রামের এই মিলনকেন্দ্রগুলিতে লোক এসে জমায়েত হয় বটে, কিন্তু এগুলোর গঠন বা রক্ষণ গ্রামের সকলের উদ্যোগে হয় না—হয় কয়েকজন উৎসাহী ব্যক্তির উদ্যোগে, যাঁরা গ্রামের বারোয়ারী, যাত্রা, গ্রন্থাগার সব কিছুর প্রাণ। সুতরাং খুব সম্ভবতঃ গ্রন্থাগার যেটার কাজ নিত্য নিয়মিতভাবে চলা দরকার,—সেইটাই হ'য়ে উঠ্‌বে পল্লীর স্বাভাবিক মিলন-কেন্দ্র। কাজেই বয়স্ক-শিক্ষাকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে হ'লে যে গ্রন্থাগারের সাহায্য ও সাহচর্য একান্ত প্রয়োজন, একথা অস্বীকার করা চলে না।

গ্রন্থাগার ও বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ দরকার, একথা প্রতিপন্ন করা হয়ে গেলে তারপর সহজেই প্রশ্ন উঠবে—গ্রন্থাগারকে কেমন ক'রে গঠন করলে এ বয়স্ক-শিক্ষার প্রকৃত সহায়ক হয়ে উঠবে।

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের হয়তো এ মেনে নিতে কুণ্ঠা হবে না যে গ্রন্থাগারকে—বিশেষ ক'রে পল্লীর অনগ্রসর অঞ্চলের গ্রন্থাগারকে, বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারের মত শুষ্ক জ্ঞানালোচনার কেন্দ্র ক'রে গঠন করা চ'ল্‌বে না। গ্রন্থাগারকে বাড়্‌তে হ'লে একে সবচেয়ে আগে পল্লীর সার্থক মিলনকেন্দ্র হ'য়ে উঠতে হবে। এখানে আনন্দের প্রচুর খোরাক সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে। খেলা-ধূলা, গান-বাজনা, কথাবার্তার ব্যবস্থা এখানে রাখা দরকার। এগুলোকে নির্বাসিত ক'রে জ্ঞান-সাধনার তপঃক্ষেত্র ক'রে

গ্রন্থাগারকে গঠন ক'রলে দু'এক জন ব্যক্তি কদাচিৎ গ্রন্থাগারে আস্‌তে পারে বটে, কিন্তু গ্রন্থাগার মোটামুটি পাঠক-বিবর্জিত শূন্য মরুক্ষেত্র ব'লেই মনে হবে।

অবশ্য আমরা যে রকম ভাবে গ্রন্থাগার গঠনের কথা বল্‌ছি সর্বত্র সব গ্রন্থাগার নিশ্চয়ই এভাবে গঠিত করতে হবে না। জনবহুল সহরের গ্রন্থাগারে এসব অয়োজন শুধু নিষ্প্রয়োজনই নয়, হয়ত বা ক্ষতিকরও। বিশ্ববিদ্যালয়ের, বিশেষজ্ঞপ্রতিষ্ঠানের, বা প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত- গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রবর্তন করতে যাওয়া বাতুলতা। কিন্তু জনবিরল, অনগ্রসর পল্লীর পক্ষে এ আয়োজন আবশ্যিক। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা যাঁরা স্বীকার করবেন, তাঁদের পক্ষে এটুকু ব্যতিক্রম করা কুণ্ঠার কারণ হবে না। বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মত অনগ্রসর দেশের সমস্যার সঙ্গে অগ্রসর দেশগুলোর সমস্যা নিশ্চয়ই আলাদা। তাই সে সব দেশে এই সব আয়োজনের প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। কিন্তু শিশু গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে ওসব দেশেও এ আয়োজন বর্জনীয় বলে বিবেচিত হয় নি। তাই গ্রন্থাগারকে এইভাবে গঠন করার পথে আমাদের যদি কোন সংস্কারগত বাধা থাকে তা' আমাদের নিঃসঙ্কোচে উৎপাটিত কর্‌তে হবে।

পাঠকদের আকর্ষণ ক'রে মিলিত করার জন্য যেমন আনন্দের আয়োজন রাখ্‌তে হবে গ্রন্থাগারে, তেমনই কর্মীদের সংঘবদ্ধ করার আয়োজনও গ্রন্থাগারে রাখ্‌তে হবে। একথা সত্য যে কর্মীরা নিজেদের ব্রতের বা আনন্দের জন্যই গ্রন্থাগারে সমবেত হবে, তবুও গ্রন্থাগার তাদের কিছু প্রত্যক্ষ সেবায় আস্‌তে পারলে তাদের মিলনটা যে একেবারে নিশ্চিত হবে, একথা বলাই বাহুল্য। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার বা বয়স্কশিক্ষার কর্মী প্রধানতঃ খুঁজে নিতে হবে ছাত্রদের মধ্য থেকে। ছাত্রাবস্থা অতিক্রম ক'রে গেলে আমাদের দেশের কৃতবিদ্য অনেকেরই গ্রামে থাকা সম্ভব হয় না, সঙ্কুচিত

জীবিকা-অর্জন ব্যবস্থার অসুবিধার জন্য। তাই ছাত্রদের মধ্য থেকেই আমাদের কর্মী সংগ্রহ করতে হবে। বস্তুতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর ছাত্র এরা ছাড়া আমাদের আর একাজের কোন কর্মীই নেই। কিন্তু আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের ছাত্ররা অনেকেই দরিদ্র, তার উপর বিদ্যালয়ের অসন্তোষজনক উপদেশ মাত্র অনেক সময় তাদের পাঠের যথোচিত আনুকূল্য করতে পারে না। তাই এই সব কর্মীর সুবিধার জন্য গ্রন্থাগারের কার্যকাল ছাড়াও অন্য সময় গ্রন্থাগার খুলে রাখলে, গ্রন্থাগারে কর্মীদের প্রয়োজনীয় পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ ক'রে রাখলে, আর, যদি সম্ভব হয়, গ্রন্থাগারের অনগ্রসর ছাত্রকর্মীদের পাঠাভ্যাসে কিছু সাহায্য করবার জন্য প্রস্তুত থাকলে, ঐ সব ছাত্রের কাছ থেকে বহু কাজ পাওয়া যায়—এ আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।

যাই হোক্, কর্মীদের অনুকূলে এই ব্যবস্থাটুকু করা বাঞ্ছনীয় হ'লেও, হয়তো একান্ত আবশ্যিক নয়। কিন্তু পাঠকদের মিলনকেন্দ্র ক'রে গ্রন্থাগারকে গড়ে তোলা—লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য।

তার পরে কথা উঠবে গ্রন্থাগারে সকলকে না হয় মিলিত করা গেল, কিন্তু তাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্য কতটা সার্থক হ'ল? আমরা গ্রন্থাগারে সকলকে মেলাচ্ছি একটা উদ্দেশ্য সাধনের উপায় হিসাবে—শুধুমাত্র আনন্দ পরিবেশনের জন্য নয়। এই সত্যটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে এই বিপুল সংখ্যক লোকদের শিক্ষায় স্বাধীনতা পাইয়ে দেওয়ার ব্রত হচ্ছে গ্রন্থাগারের। আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলোর মধ্যে এই উদ্দেশ্যকে যা'তে হারিয়ে না ফেলি সেদিকে আমাদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

যতদিন আমাদের জনগণ শিক্ষার্জনে স্বাবলম্বী হ'তে না পারবে ততদিন তাদের দেখে শুনে যতটা শিক্ষা লাভ করা সম্ভব, গ্রন্থাগারের পক্ষে তার ব্যবস্থা করা উচিত। ভাল বক্তৃতা শুনিয়ে, ছায়াচিত্র-সহযোগে বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়ে, চলচ্চিত্র দেখিয়ে, ছবি দেখিয়ে, থিয়েটার যাত্রার

মাধ্যমে বা রেডিও শুনিয়ে আমাদের লোকদের সামাজিক ও নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব শিক্ষা দিতে হবে। গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ব'লেই মাত্র গ্রন্থাগারকে এর দায়িত্ব নিতে হবে তা' নয়—গ্রন্থাগারেই মাত্র সেই সব লোক থাকা সম্ভব যাঁরা বক্তৃতাদি শোনার পর জনগণের মনে যে সব প্রশ্ন জাগ্‌তে পারে তার উত্তর দিতে পারেন। গ্রন্থাগারের সঞ্চয়ের মধ্যে হয়তো এমন বই থাকতে পারে যার সাহায্যে জিজ্ঞাসু পড়্‌তে জান্‌লে নিজেই নিজের কৌতূহল মেটাতে পারে। মোট কথা, সারা গ্রামের মধ্যে জ্ঞানের সব রকম প্রশ্ন সমাধান করার জায়গা একমাত্র গ্রন্থাগারই হবে। পাঠক নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজে প'ড়ে নিতে না পার্‌লে যদি তাকে উত্তরের জায়গা পড়ে শোনান হয় তা'হলেও কাজ মিটে যায়। ফল কথা, যে জ্ঞান আবশ্যক সেই জ্ঞান সংগ্রহ ও বিতরণের কেন্দ্র, হবে আমাদের গ্রন্থাগার। তাই গ্রন্থাগার শ্রোত্র, নেত্র যে কোন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। স্বাবলম্বনের অসামর্থ্যের আপত্তি তুলে জনগণকে সাহায্য করতে ইতস্ততঃ করাও আমাদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কেননা অনেক সময় কি ব্যস্ত পাঠককে আমরা কোষগ্রন্থ থেকে নানারকম সংবাদ সংগ্রহ ক'রে দিয়ে থাকি না?

অক্ষর-জ্ঞানের একান্ত প্রয়োজনীয়তা আজ সকলেই, বিশেষ ক'রে যাঁদের অক্ষর জ্ঞান নেই তাঁরা, উপলব্ধি ক'র্‌ছেন। তবুও জনগণের মিলন-কেন্দ্রে যদি দেওয়াল-চিত্র, পোষ্টার প্রভৃতির সাহায্যে এই বিষয়ের গুরুত্ব বোঝান হয়, তবে তা' কি বয়স্ক-শিক্ষার কাজের অনেকখানি সহায়ক হবে না?

গ্রন্থাগার অক্ষর-পরিচয় লাভের জন্য জনমনে আগ্রহের সৃষ্টি কর্‌তে পারে; বক্তৃতা, রেডিও, যাত্রা প্রভৃতির সাহায্যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো সকলকে জানিয়ে দিতে পারে; দৈনন্দিন সংবাদপত্রের আলোচনা ক'রে সকলকে সাময়িক সমস্যাগুলোর বিষয়ে অবহিত কর্‌তে পারে। কিন্তু

বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের কাজ ঐটুকু মাত্র নয়। এমন কি আমার মতে ঐ কাজটুকু গ্রন্থাগারের প্রধান কাজও নয়।

বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রধান দায়িত্ব হ'চ্ছে বয়স্কদের অর্জিত অক্ষরজ্ঞানকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা। বেশী বয়সে আমরা কোন জিনিষ শিখি যেমন তাড়াতাড়ি, ভুলিও তেমনি তাড়াতাড়ি। তার উপর অক্ষরগুলোকে বার বার লিখে প'ড়ে অভ্যাস দুরস্ত না রাখ্‌লে মনের পিছল-পথে তারা কখনই দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারে না। অথচ বয়স্কদের পড়ার বই খুব সহজ-লভ্য নয়। গ্রন্থাগারকে প্রথমত খুঁজে চেষ্টা ক'রে বয়স্কদের মত বই কিন্‌তে হবে। তার পরে বয়স্কদের বই যদি সব সময় জোগাড় করা না যায়, তবে তাদের জন্য বৈকল্পিক পাঠ্য বিষয় সরবরাহ কর্‌তে হবে। মোট কথা বয়স্কদের পড়ার অভ্যাস করিয়ে তাদের সাধারণ পাঠক শ্রেণীতে পরিণত করা গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্য।

প্রসঙ্গতঃ বয়স্কদের বই সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বয়স্কদের ছোট অক্ষর পড়্‌তে সময় নেবে। ছোট ছেলেরাও যেমন প্রথম প্রথম ছোট অক্ষরের বই পড়তে পারে না, বয়স্করাও তেমনি প্রথম ছোট বা সাধারণ অক্ষরের বই পড়তে পারবে না। দুটো বড় জিনিষের অন্তর যত সহজে প্রথমেই ধরা পড়ে, অনভ্যস্ত চোখে তত সহজে দুটো ছোট বা সূক্ষ্ম জিনিষের পার্থক্য ধরা পড়ে না। অথচ প্রথম প্রথম অক্ষরগুলোর ভেদ অভ্যাস করান একটা কম কথা নয়। তাই প্রাথমিক বই, কি বড় কি ছোট কারুর জন্যেই, ছোট অক্ষরের হ'লে চল্‌বে না।

ছোটদের-জন্য-বিশেষ-ক'রে-ছাপান বড় অক্ষরের বই দিয়েও বয়স্কদের চাহিদা মিট্‌বে না—কেননা ছোটদের জন্য ভাল বই যে মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা ক'রে রচিত হ'য়েছে বয়স্কদের মন তার চেয়ে অনেক বেশী পূর্ণতাপ্রাপ্ত। তাই ছেলেমির যে সব কথা ছোটদের মনোরঞ্জন করবে, বড়দের তাই পরিবেশন করলে তা তাদের বিরক্তিই উৎপন্ন করবে।

বড়দের জন্য লেখা বই সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে। তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে বইয়ের কলেবর বাড়ানো এক্ষেত্রে একেবারেই অন্যায়। কেননা একটা বই পড়তে যে ধৈর্যের দরকার তার অনেকখানিই অভ্যাস-সাপেক্ষ। তা' ছাড়া পড়ার গতি নির্ভর করে অক্ষিগোলকের চলমানতার উপর। অনভ্যাসের ফলে বয়স্কদের অক্ষিগোলক দ্রুত-চলমানতার গুণ অর্জন করে না। তাই বই পড়তে তাদের স্বভাবতঃই দেরী হবে। এর উপর যদি বই বড় হয়, তবে বইয়ের শেষ পর্যন্ত যাবার ধৈর্য না থাকার সম্ভাবনাও যেমন আছে, তেমনই আছে একখানা বই অনেকদিন ধ'রে পড়ার একঘেয়েমির বিরক্তি। এই দুটো এড়াবার জন্য বড়দের বই হওয়া উচিত সংক্ষিপ্ত।

বড়দের বই এর বেশ কিছু অংশ বৃত্তিসম্পর্কে রচিত হওয়া উচিত। বয়স্করা জীবনক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। সুতরাং জীবনের প্রত্যক্ষ সমস্যাগুলো অহরহঃ তাদের সামনে এসে উপস্থিত হয়। এইগুলোই তাদের জীবিত সমস্যা। তত্ত্ব নয়, ব্যবহারিক প্রয়োজনই তাদের প্রধান বিবেচ্য, তাই বৃত্তি সম্বন্ধে ব্যবহারিক গ্রন্থ বয়স্কদের পক্ষে বেশী উপযোগী।

বয়স্কদের গ্রন্থ সম্বন্ধে এই যে সামান্য আলোচনা করা গেল, এর থেকেই বড়দের পড়াবার মত বই সংগ্রহের সমস্যাটা অনেকখানি বোঝা যাবে। আমাদের দেশের প্রকাশকরা স্কুল বা কলেজ পাঠ্য পুস্তক ছাড়া সহজে আর কোন পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চান না। সরকারী প্রচেষ্টায়ও এখনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই ছাপান হয়নি, বস্তুতঃ জন-শিক্ষা ছাড়া বড়দের হাতে দেবার মত কোন কিছু সরকারী চেষ্টায় এখনও ছাপা হ'য়েছে বলে আমি জানি না। এ অবস্থায় বয়স্কদের সত্যকার উপযোগী গ্রন্থের সংখ্যা এখনও এতই পরিমিত যে গ্রন্থাগারিকের তার উপর নির্ভর করা খুবই কঠিন।

সুতরাং গ্রন্থাগারিকের নিজেরই বৈকল্পিক পাঠ্য সরবরাহের ভার নিতে হবে। ভাল প্রাচীর-পত্র লিখে দেওয়ালে টানিয়ে রাখলে বয়স্কদের

শেখাবার খুবই উপযোগী হবে। হয় কাষ্ঠফলকে নয় প্রাচীর-পত্রে প্রতি-দিনের প্রধান প্রধান সংবাদ লিখে রাখা দরকার। সপ্তাহে একদিন যদি বক্তৃতা বা আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়, তবে সেই আলোচনার সারমর্ম প্রাচীর পত্রে বয়স্কদের মতন করে লিখে দেওয়া উচিত। হাতে লেখা পত্রিকা বয়স্কদের জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারের উচিত বয়স্ক পাঠকদের সম্বন্ধে কতগুলো খবর রাখা। প্রথম—তাদের মোট সংখ্যা কত। দ্বিতীয়—তারা কয়জন প্রাচীর-পত্র বা কাষ্ঠফলকের লেখার চেয়ে বেশী পড়ার ধৈর্য ও যোগ্যতা অর্জন ক'রেছে। তৃতীয়—তাদের মধ্যে কতজন সাধারণের পাঠ্য বই পড়ার অধিকারী হয়েছে। গ্রন্থাগারিক মোটামুটি এই খবরগুলো সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌লে তবেই অক্ষরজ্ঞানপ্রাপ্ত বয়স্কদের উপযোগী পুস্তক নির্বাচন ও সংগ্রহ কর্‌তে পার্‌বেন।

উপরে যা, বলা হ'ল এতেই হয়তো অনেকটা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে গ্রন্থাগারে পাঠের ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। বয়স্করা গ্রন্থাগারের বাইরে আর প্রাচীর-পত্র, পোষ্টার প্রভৃতি পড়্‌বার জন্য পেতে পার্‌বে না। তাই গ্রন্থাগার মাত্র বই-দেওয়া-নেওয়ার প্রতিষ্ঠান হ'লে চল্‌বে না। এখানে ব'সে পড়ার ব্যবস্থা থাকা চাই। বয়স্কদের পড়্‌বার সময় সাহায্য করার জন্য ইচ্ছুক কর্মী থাকা চাই।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠ্‌বে—আনন্দের বিবিধ আয়োজন, তাস পাশা, রেডিও প্রভৃতি কি পড়ার প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি কর্‌বে না? যদি করে, তা' হ'লে এই দুটোকেই একসঙ্গে কী করে সমন্বিত করা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বল্‌তে হবে, যেখানে সঙ্গতি থাকবে সেখানে পাঠ-কক্ষটাকে আলাদা রেখে অন্য সব কাজ একজায়গায় করা যেতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে ক'টা গ্রন্থাগারের সঙ্গতি আছে? তাই এই উত্তরে আমরা ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারি না। আমার মনে হয় যদি গ্রন্থাগারের

কার্যকাল কিছুক্ষণ নির্দিষ্ট রেখে তারপর আমরা ঐখানেই আমোদ-প্রমোদ করি তাহলে হয়তো সমস্যাটার অনেকখানি সমাধান হতে পারে। এ আপত্তি হয়তো করা হবে যে তাহলে পল্লীর কিছু সংখ্যক লোক দেরী ক'রে গ্রন্থাগারের কার্যকাল উত্তীর্ণ হ'লে তবে শুধু আমোদ-প্রমোদ কর্‌তেই ওখানে এসে জড় হবে। কিন্তু যদি গ্রন্থাগারকে আকর্ষণযোগ্য ক'রে তুলতে না পারি—তাহলে স্বতন্ত্র পাঠকক্ষ ক'রেও কি আমরা সকলকে টেনে আন্‌তে পার্‌ব? পৃথিবীর কোথায়ও কি জনসংখ্যার বেশীর ভাগ লোক গ্রন্থাগার ব্যবহার করে? যাই হোক, যদি সঙ্গতি থাকে পাঠকক্ষকে নিশ্চয়ই আলাদা করতে হবে। কিন্তু সঙ্গতি না থাক্‌লে ঐ চেষ্টা করার চেয়ে গ্রন্থাগার-কার্যের সময় নির্দিষ্ট ক'রে, পাঠকদের সত্যকার কল্যাণকর কাজ করার দিকে বেশী মন দেওয়াই উচিত ব'লে আমার মনে হয়। উপরে যা ইঙ্গিত করা হয়েছে, তাতেই প্রতিপন্ন হবে, বয়স্কশিক্ষার জন্য গ্রন্থাগার-পরিচালনার কাজে খাটুনি, চিন্তা, গঠনমূলক কল্পনা, সহানুভূতি, সেবাপ্রবৃত্তি কোনটাই কম দরকার নয়। এগুলোর ঠিক্ ঠিক্ প্রয়োগ ক'রে জাতি গড়াই এখন আমাদের দেশের প্রধান সমস্যা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গ্রন্থাগার

আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলোকে জাতির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ কর'তে হবে, এই অনুভূতিই গ্রন্থাগারকে প্রকৃতপক্ষে লোকশিক্ষার বাহন ক'রে গ'ড়ে তুলবে। জাতির অন্যতম প্রধান প্রয়োজন নিরক্ষরতা-দূরীকরণ ও প্রাথমিক জ্ঞান-বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'য়েছে। কিন্তু এটা আমরা খুবই আশা করি, কয়েক বছরের মধ্যেই নিরক্ষরতার কালিমা আমাদের দেশ থেকে দূর হ'য়ে যাবে। এমনকি এখনও সাক্ষর-দের সংখ্যা নগণ্য নয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বয়ং বিচরণ করবার যোগ্যতা যাঁদের জন্মেছে—তাঁদের লক্ষ্য ক'রেই গ্রন্থাগারের বর্তমান রূপটি গ'ড়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার তাঁদের সেবার জন্য, তাঁদের শিক্ষাকে গভীরতর ক'রে তোল্‌বার জন্য কী কর্‌তে পারে, এটা এবার আমাদের ভাব্‌বার কথা।

গ্রন্থাগার ব্যবহারের দিক্‌ থেকে সাক্ষরদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আমরা তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক, অথচ যাঁদের বিদ্যালয়ে প্রবেশ কর্‌বার সুবিধা নেই, তাঁদের বিষয় সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদে আলোচনা কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ব।

আমাদের দেশে, যোগ্যতা ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রের মূল্য যে প্রচুর একথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। এখনও বহুবিধ কর্মে—যার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার কোনই সম্পর্ক নেই সেই সব কর্মেও প্রবেশলাভের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র একান্ত আবশ্যক ব'লে মনে করা হয়। সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য যথেষ্টই দেওয়া হয়। বস্তুত: বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রের উপর এই

অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের ফলেই হয়তো আমাদের দেশের বহু ছাত্র নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হ'য়েও অসাধ্য সাধনের আকাঙ্ক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা করে। যাই হোক্, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশংসাপত্রের মূল্য বেশী মনে করা উচিত কিনা সেটা আমাদের এক্ষেত্রে বিবেচ্য নয়। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার প্রভাব গ্রন্থাগারের উপর কতখানি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা এতদিন পর্যন্ত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা কলেজে না প'ড়েও দেওয়া যেত বটে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যও স্কুলের খাতায় নাম লেখানো একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল না। কিন্তু মধ্যবর্তী বিপুলসংখ্যক পরীক্ষার্থীই যে বাধ্যতামূলকভাবে কলেজে ঢুকত সে কথা অনস্বীকার্য। যাই হোক্, সম্প্রতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষামূলকভাবে সব শ্রেণীর ছাত্রকেই কলেজে না প'ড়েও পরীক্ষা দেবার অধিকার দিয়েছেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা মাত্র কলেজ-স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে সীমায়িত থাক্‌বে না, এটা খুবই আশা করা যায়।

এই পরিবর্তিত পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর্‌বার আগে সাধারণতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের গ্রন্থাগার কতটুকু সাহায্য ক'র্‌তে পারে সেই কথাই আলোচনা করা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় ও গ্রন্থাগার উভয়েই জ্ঞানের সাধনায় নিযুক্ত, উভয়েরই আকাঙ্ক্ষা শিক্ষার অনুশীলনের ব্যবস্থা ক'রে জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সুতরাং উভয়ের কার্যের মধ্যে সংযোগ ও সমন্বয় সাধন একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যাবশ্যক পরিপূরক। জ্ঞান-সাধনের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা যে উপদেশ দেন, তা' কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে পারে না। তা' আরও বেশী সাধনার জন্য শিক্ষার্থীকে উদ্বুদ্ধ ক'র্‌তে না পার্‌লে শিক্ষার অগ্রগতি কখনও সম্ভব হয় না। সেই সাধনার ক্ষেত্র হ'চ্ছে

গ্রন্থাগার বা পরীক্ষামন্দির। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সমাপ্তি থাক্‌লেও গ্রন্থাগারের কার্যের শেষ নেই। সেই জন্যই যুগে যুগে দেশে দেশে যেখানেই বিশ্ববিদ্যালয় গ'ড়ে উঠেছে সেইখানেই তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা হ'য়ে গ'ড়ে উঠেছে গ্রন্থাগার। বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারেরও আকার এবং যশ বেড়ে উঠেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর শিক্ষার কথা ছেড়ে দিলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠদ্দশায়ই বিদ্যার্থীদের কাছে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন কম নয়। শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্যার্থীকে নিজের চেষ্টায় কোন কোন গ্রন্থের অংশবিশেষ প'ড়ে নিতে বলেন, সব জিনিষের সারসঙ্কলন ক'রে দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কিংবা কোন একখানা গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যার্থী সবগুলো আলোচ্য প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না। তাই নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তক, কিংবা শিক্ষকের উপদেশ মাত্রকে সম্বল ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়-সমুদ্র পার হওয়া সুকঠিন। তাই শিক্ষার্থীদের বহু গ্রন্থ দেখা শুনা কর্‌বার জন্য গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হ'তেই হয়। যারা গ্রন্থাগারে আসে না, কিংবা নিজের চেষ্টায় জ্ঞান-আহরণের অভ্যাস করে না, তারা যদি কোন ক্রমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তবুও তাদের শিক্ষা পরীক্ষাসীমার বহির্ভাগে বেরোতে পারে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠদ্দশায় ছাত্রদের গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের দেশের কলেজগুলোর গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা কিন্তু মোটেই সন্তোষ-জনক নয়। সর্বত্রই কলেজের বই-সংগ্রহের মধ্যে এক বইয়ের একাধিক প্রতিলিপি থাকা প্রয়োজন—পুস্তক সংগ্রহও, পাঠ্য-বিষয়গুলোর জন্য অন্ততঃ, সুপ্রচুর হওয়া উচিত এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অনুসৃত হওয়া গ্রন্থাগারের বিশেষত্ব হওয়া কর্তব্য। তা' না হ'লে ছেলেরা তাদের আকাঙ্ক্ষিত বই সহজে পেতে পার্‌বে না, আর গ্রন্থাগারের সঙ্গে শিক্ষকের উপদেশের সমন্বয় সাধনও ক'র্‌তে পার্‌বে না। প্রত্যেক কলেজের জন্য প্রশস্ত পাঠকক্ষ থাকা একান্ত প্রয়োজন।

কলেজের গ্রন্থাগারিকদেরও এমন যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দরকার যাতে তাঁরা ছাত্রদের পড়ার অভ্যাস গঠনে সাহায্য কর্‌তে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে খুব সীমাবদ্ধ দুই একটি প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোথায়ও পূর্বের এই তিনটি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় না। কলেজের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত হ'লে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর দায়িত্ব অনেক ক'মে যেত। কিন্তু যে জন্যই হোক্, কলেজের গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা আমাদের দেশে যথেষ্ট নয়, তাই সাধারণ গ্রন্থাগারকেও এবিষয়ে আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ ক'র্‌তে হয়।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে এর দ্বারা সাধারণ গ্রন্থাগারের ভার বুঝি খুবই বেড়ে গেল। কিন্তু আমরা আগেই দেখিয়েছি, শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন নয়, একই। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের সাহায্য কর্‌লে গ্রন্থাগার নিজের কাজই কর্‌বে—বাড়্‌তি কাজ করার বোঝা বহন কর্‌বে না। কেননা গ্রন্থাগার যদি আমাদের সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞানের শিক্ষা দিতে চায়, সে যদি আমাদের মাত্র কথা-সাহিত্যের মধ্যে আবদ্ধ রাখ্‌তে না চায়, তা' হ'লে সে যে সব বই সংগ্রহ ক'র্‌বে তা'তে ছাত্রদের, পরীক্ষার্থীদের উপকার হ'তে বাধ্য। সুতরাং গ্রন্থাগারের নিজের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হ'লেই পরীক্ষার্থীদের অনেকখানি সাহায্য আপনিই ঘ'টে যাবে।

কিন্তু আমাদের দেশের অনেক ছাত্রই পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত গ্রন্থ পাঠে অভ্যস্ত নয় ব'লে গ্রন্থাগারগুলোর এই বিপুল আয়োজন অনেক সময় সদ্ব্যবহারের অভাবে ব্যর্থ হ'য়ে যাবার আশঙ্কা আছে। তা'ছাড়া কলেজের গ্রন্থাগারগুলোর ছাত্রদের জন্য এবং শিক্ষকদের জন্য যে দায়িত্ব আছে সাধারণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তার চেয়ে অনেক বেশী বিস্তৃত। সুতরাং মাত্র কয়েক প্রকারের বইয়ের মধ্যেই আপনার সংগ্রহকে সীমাবদ্ধ রাখ্‌লে সাধারণ গ্রন্থাগারের চলে না। তাত্ত্বিক আলোচনাময় গ্রন্থও যেমন এখানে

রাখা দরকার তেমনই দরকার এখানে গল্প-উপন্যাস, খেলা-ধূলা, খেয়াল-খুসীর বই। তাই সাধারণ গ্রন্থাগার সুগঠিত হ'লেই ছাত্রদের কাজ মিটে যাবে, এ-কথা সর্বাংশে সত্য নয়। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন করতে হ'লে সব সময়ই গ্রন্থাগারকে নিজের প্রকৃত পাঠকদের কথা মনে রেখে কাজে এগোতে হয়। সব জাতের পাঠকের জন্য সব বই সংগ্রহ করা হয়ত জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে সম্ভব হ'তে পারে, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী ছাত্রদের সত্যিকার উপকার করতে চাইলে, গ্রন্থাগারকে খবর রাখ্‌তে হবে তার পাঠক-শ্রেণীর মধ্যে কতজন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী। তাকে জেনে নিতে হবে, ঐ সব ছাত্র কোন্ কোন্ বিষয়ে পরীক্ষা দিবে। এই খবর সংগ্রহ ক'রে তার পরে গ্রন্থাগারকে পুস্তক নির্বাচনের কাজে এগিয়ে যেতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, হয়তো গ্রন্থাগার মাত্র কয়েকজনের উপর পক্ষপাতমূলক ব্যবহার করছে, কিন্তু ধীর ভাবে ভেবে দেখ্‌লে দেখা যাবে, একথা সত্য নয়। গ্রন্থাগার এই পথে যদি চলে তবে আপনার স্বার্থরক্ষার জন্যই চল্‌বে—ঐ সব ছেলেদের প্রাপ্যাতিরিক্ত সাহায্য করবার প্রবৃত্তিতে নয়। কেননা, গ্রন্থাগারের সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং সার্থক পাঠক-গোষ্ঠীই হবে—ঐ পরীক্ষার্থী ছাত্রের দল। অবশ্য যদি কোন সাধারণ গ্রন্থাগার কোন গবেষক বা বিশ্ববিদ্যালয়োত্তর শিক্ষায় নিযুক্ত পাঠক সংগ্রহ ক'রতে পারে, তার কথা আলাদা। কিন্তু এখনও আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর যে অবস্থা তা'তে অনেক গ্রন্থাগারেরই এই সৌভাগ্য নেই, একথা বল্‌লে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদেরই গ্রন্থাগারের সব চেয়ে নিয়মিত, নির্ভরযোগ্য এবং সার্থক পাঠক ব'লে মনে কর্‌তে হবে। ঐ পরীক্ষার্থীরা যদি কোন কলেজের ছাত্র না হয় তবে ত' সাধারণ পাঠাগারই তাদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হবে—যদি ওরা কোন কলেজের

ছাত্রও হয় তবুও কলেজ-গ্রন্থাগারের পরিপূরক হিসাবে এই সব সাধারণ গ্রন্থাগার ছেলেদের কাছে আদর পাবেই পাবে।

যাই হোক্, পুস্তক নির্বাচনের প্রসঙ্গে আমাদের কিন্তু আরও দু-একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। বর্তমান অবস্থায় আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর আর্থিক দুরবস্থা এত শোচনীয় আর বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় বইও বেরোচ্ছে এত বেশী যে এই সমস্ত বই কিনে তা' দিয়ে তারা খুব বেশী বিভিন্ন বিষয়ের পক্ষার্থীদের উপকার ক'র্‌তে পার্‌বে কিনা খুবই সন্দেহ। তার উপর পরীক্ষার আলোচ্য বিষয়গুলোও এত বিস্তৃত এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর আলোচনা ও গবেষণা এত হ'চ্ছে যে ভাল ভাবে পড়াশুনা কর্‌বার আকাঙ্ক্ষা যে সব ছাত্রের আছে তাদের এক বিষয়ের জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত করাই দুরূহ সমস্যা হ'য়ে উঠেছে। এ ছাড়াও শুধু দুরূহ এবং গভীর আলোচনাযুক্ত পুস্তক সংগ্রহ ক'রে যে সব ছেলে কলেজে না প'ড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে চায়, তাদের খুব উপকার করা যাবে না। তাদের জন্য সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ কর্‌তে হবে প্রথম-পাঠ্য-প্রবেশক পুস্তক, বিভিন্ন আলোচনার সংক্ষিপ্তসার এবং এমন কি হয়তো পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্নোত্তরের গ্রন্থও। তাই গ্রন্থাগারের পক্ষে সাধারণ সংগ্রহ বিষয়ে নিজের মান বজায় রেখে আবার পরীক্ষার্থীদের জন্য এতটা আয়োজন ক'রে ওঠা সম্ভব হবে কি না এটা খুবই ভাব্‌বার কথা।

এই সমস্যার সমাধান কর্‌তে হ'লে এক অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ও সমন্বয় সাধনের আয়োজন কর্‌তে হবে। কোন একটি গ্রন্থাগার যেমন সব বিষয়ের ছাত্রের সুবিধায় আস্‌তে পার্‌বে না, তেমনই পাশাপাশি দুটো গ্রন্থাগারও এক বিষয়ের ছাত্রদের সুবিধা করবার চেষ্টা কর্‌বে না। এক জায়গায় যে আয়োজন আছে, পাশেই যদি সেই আয়োজন করি, তবে এক জায়গার আয়োজন বৃথা হ'য়ে যেতে পারে। আমাদের সামান্য সামর্থ্যের কিছুই

অপব্যয়িত না হয় এটা দেখা আমাদের দেশের স্বার্থে সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তাই গ্রন্থাগারগুলোর নিজেদের আলোচনা ক'রে ঠিক্ করে নেওয়া দরকার, কোন্ গ্রন্থাগার কোন্ বিষয়ের বই প্রধানভাবে সংগ্রহ কর্‌বে। অবশ্য এটা ঠিক্ কর্‌তে হবে, আলোচনার সময়ে গ্রন্থাগারগুলোতে পাঠকদের চাহিদা দেখে। তাই এ আশঙ্কা নিশ্চয়ই আছে যে পাঁচ বছর বাদে কোন গ্রন্থাগারের পাঠকের রূপ পরিপূর্ণ ভাবে বদ্‌লে যাবে, অথচ সেই জন্য যদি গ্রন্থাগারকে আবার নতুন ক'রে আর এক বিষয়ে বিশেষভাবে পুস্তকসংগ্রহ কর্‌তে হয়, তা' হ'লে তাদের পক্ষে কাজটা হবে খুব কঠিন। কেননা, একদিকে যেমন এতদিন ধ'রে সংগ্রহ না করার জন্য নতুন বিষয়ে তাদের সংগ্রহ অনেকখানি পেছনে প'ড়ে আছে, তেমনই যে বিষয়ে তাদের সংগ্রহ মোটামুটি ভাল ছিল, সে বিষয়কে ছেড়ে বিষয়ান্তরের সংগ্রহকে প্রাধান্য দিতে যেয়ে ঐ বিষয়েও গ্রন্থাগারের সংগ্রহ পিছিয়ে প'ড়্‌বে। তার ফলে গ্রন্থাগারের কোন সংগ্রহই ভাল হবে না—কোন বিষয়েই সে ছাত্রদের যথোচিত উপকার কর্‌তে পার্‌বে না। সেইজন্য সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকদের পরিবর্তন হ'ল ব'লেই গ্রন্থাগার নিজের বিশেষ বিষয়কে পরিত্যাগ ক'রে বিষয়ান্তরকে গ্রহণ কর্‌বে না। নতুন পাঠকদের সাহায্য করবার জন্য সে অন্য গ্রন্থাগারের কাছ থেকে বই ধার করবে, অন্য গ্রন্থাগারে পাঠককে পরিচয়-পত্র দিয়ে পাঠিয়ে দেবে। ফল কথা, গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে আন্তরিক সহযোগিতা থাক্‌লে এই সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন হবে না।

এইবার সংক্ষেপে আলোচনা কর্‌তে হবে, একটি গ্রন্থাগার কোন্ বিষয়ে বিশেষভাবে বই সংগ্রহ ক'র্‌বে, তা' ঠিক করবার মান কী হবে। উপরে বলা হ'য়েছে তদানীন্তন পাঠকদের রীতি প্রকৃতির উপরই এই বিষয় নির্বাচন ব্যাপারটা নির্ভর ক'র্‌বে। কিন্তু যদি পাঠকদের রীতি প্রকৃতি হয় পরিবর্তনশীল তা' হলে ঐ মানের উপর নির্ভর করা কতখানি

যুক্তিসঙ্গত হবে এটা খুবই জিজ্ঞাসা করা যায়। মনে হ'বে যে আমাদের প্রস্তাব—সবরকম জাতের মানুষের থেকে আচমকা দু'জনকে তুলে নিয়ে 'এদের মতই আমাদের অধিকাংশের মত'—এই মন্তব্যের মত যুক্তি হীন। তাই কথাটার সামান্য আলোচনা করা দরকার।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের বিশেষ বিষয়টা নির্ণীত হয় গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা, রুচি ও শিক্ষার উপর। যদি গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগার-সচিব সাহিত্যে পারদর্শী হন, তবে স্বভাবতঃই তাঁর সাহিত্যের বই-এর ঝোঁক থাকে আর গ্রন্থাগার সেই জাতীয় বইতে ভ'রে ওঠে। তা'ছাড়া শেষ পর্যন্ত যখন বই কেনার দায়িত্বের অনেকখানিই এঁদেরই গ্রহণ করতে হয়, তখন এঁদের সুবিধামত ও পছন্দমত বই কেনাই ত' উচিত। বিশেষ ক'রে এঁরা গ্রন্থাগারের স্থায়ী অঙ্গ। পাঠকদের দল যত তাড়াতাড়ি বদ্‌লে যায় খুব সম্ভবতঃ এঁরা তত তাড়াতাড়ি বদ্‌লান না। তাই নিরন্তর-পরিবর্তনশীল পাঠকদের উপর নির্ভর করার চেয়ে এঁদের উপর নির্ভর ক'রেই গ্রন্থাগারের বিশেষ বিষয় নির্বাচন করা কি যুক্তিযুক্ত নয়?

উত্তরে বলা যায়, যদি কোন গ্রন্থাগার কোন বিষয়ে বিশেষ সংগ্রহ পূর্বের থেকে ক'রে থাকে, তবে সাধারণতঃ নির্বাচিত বিশেষ বিষয়ের পরিবর্তন করা উচিত নয়। এই যুক্তিতেই গ্রন্থাগারকে ঐ বিষয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু যারা বিষয় নির্বাচন ক'রে সংগ্রহ আরম্ভ করে নি', তারা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কী করবে এই আলোচনার ক্ষেত্রেই আমরা পাঠক-কেন্দ্রিক বিষয় নির্বাচনের কথা ব'লেছি। মনে রাখ্‌তে হবে, আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগার প্রধানতঃ কোন পল্লীবিশেষের সেবাই করবে। পল্লীর বাইরের কেউ যদি আমাদের গুণমুগ্ধ হ'য়ে আমাদের দ্বারস্থ হয়, তা' হ'লে আমরা গৌরব বোধ কর্‌ব নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের লক্ষ্য ক'রে কোন আয়োজন আমরা প্রধানতঃ করব না। কেননা, তার নিজের পল্লীর গ্রন্থাগার পসরা সাজিয়ে তার পথ চেয়ে ব'সে আছে। তা'কে

উপেক্ষা ক'রে সে আমার কাছে আসুক সহযোগিতাকামী গ্রন্থাগারের এ বিষয়ে উৎসাহ থাকা উচিত নয়। তাই আমার পল্লীর লোকের জন্য 'আমার গ্রন্থাগার। সেবা দিয়ে গ্রন্থাগার যদি তাকে গ্রন্থাগারমনা ক'রে তুল্‌তে পারে, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শেষ ক'রে সে কর্মী বা উপদেষ্টা হ'য়ে গ্রন্থাগারের সেবার কিঞ্চিৎ প্রত্যুপকার কর্‌বে—এ আশা কি নিতান্তই দুরাশা? যদি এটা দুরাশা না হয় তবে গ্রন্থাগারের নিরূপিত বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহ করার জন্য কর্মীর অভাব হবে কেন? তা'ছাড়া আজ গ্রন্থাগারে যে পাঠক আছে তার প্রয়োজন বিচার না ক'রে দূর ভবিষ্যতের পাঠকের জন্য সব আয়োজন তুলে রেখে আমরা কি সেই শৃগালের মত বুদ্ধিহীনতার পরিচয় দেব না, যে নর-মৃগ-শূকর-সর্পের মাংস ভবিষ্যতের জন্য রেখে তৎক্ষণাৎ ধনুর্গুণ ভক্ষণ কর্‌তে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিল?

যাই হোক্, এ বিষয়ের আলোচনার এখানেই উপসংহার করা যাক। গ্রন্থাগারকে কোন এক বা সম্ভব হ'লে একাধিক বিষয়ে বিশেষ ভাবে পুস্তক সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে আর সাধারণতঃ ঐ সব বিষয়গুলোর পরিবর্তন করা বাঞ্ছনীয় নয় এইটুকুই আমাদের প্রতিপাদ্য, বিষয়টা কেমন ক'রে ঠিক্ করা যাবে সেটা আমাদের প্রধান আলোচ্য নয়। কিন্তু এই দুটো নীতি মেনে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের কোন কাজে লাগ্‌তে হ'লে আমাদের দেশে গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা থাকা যে একান্ত প্রয়োজন এটাও প্রতিপন্ন করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বইয়ের সমস্যা এই রকম ভাবে মিটিয়ে ফেলার পর প্রধান প্রশ্ন হ'চ্ছে পাঠকদের ঐ সব বই ফলপ্রদ ভাবে পড়্‌বার যোগ্য ক'রে তোলা। গ্রন্থাগার যে বিশেষ বিষয়ের পুস্তক সংগ্রহের দায়িত্ব নেবে, সেই বিষয়ের মূল সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য যদি মাঝে মাঝে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় তা'হলে ছাত্র ও সাধারণ পাঠক দুইয়েরই খুব সুবিধা হয়। অবশ্য

গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ বই পড়ার সুযোগ দেওয়াকে কোন রকমে বিপর্যস্ত না ক'রেই এইজাতীয় আলোচনা সভার আয়োজন ক'র্‌তে হবে। এইজাতীয় সভায় বিশেষজ্ঞদের নিমন্ত্রণ ক'রে আন্‌তে হবে বক্তৃতা দেবার জন্য। আমাদের দেশে এখনও অর্থের প্রত্যাশা না রেখে বিশেষজ্ঞরা এইজাতীয় নিমন্ত্রণ রক্ষা কর্‌বার যে উদারতা প্রদর্শন করেন, তাতে উৎসাহী গ্রন্থাগারের পক্ষে এই রকম সভার আয়োজন করা কোন-ক্রমেই অসাধ্য হবে না। এ ছাড়া যদি একই বিষয়ের একাধিক পরীক্ষার্থী বা উৎসাহী পাঠক থাকেন তবে গ্রন্থাগার তাঁদের মধ্যে আলোচনা সভারও বন্দোবস্ত করতে পারে। এই সব আয়োজনের ফলে শুধু যে পরীক্ষার্থী ছাত্ররা গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুস্তকগুলো ব্যবহার ক'র্‌বার যোগ্যতা অর্জন ক'র্‌বেন তাই নয়, এ সবের ফলে তাঁদের কলেজে পড়ার কিছু কিঞ্চিৎ সুবিধাও পাওয়া হ'য়ে যাবে, এবং তাঁরা গ্রন্থাগারের আরও অনুরক্ত পাঠক ও কর্মীতে পরিণত হবেন। তা'ছাড়া যথোচিত ভাবে প্রচারিত হ'লে এই সংবাদ বাহিরের পাঠকদেরও আকর্ষণ ক'রে পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধির সাহায্য ক'র্‌বে। নীতিগতভাবে যদি গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে সহযোগিতা নাও গ'ড়ে ওঠে, এই সব ব্যবস্থার ফলে পাঠকদের তাগিদে তা গ'ড়ে উঠ্‌তে বাধ্য।

ফল কথা, কলেজে না প'ড়েও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেওয়ায় গ্রন্থাগারের পক্ষে আজ কাহিনীতর বিষয়ের পাঠক পাওয়ার যে সুযোগ এসেছে গ্রন্থাগারের পক্ষে তা' অপূর্ব বল্‌তে হবে। এই সব পাঠকদের একত্র ক'রে গ্রন্থাগার সংস্কৃতি-প্রচারের সবল কেন্দ্র হ'য়ে উঠে লোকশিক্ষা-বিস্তারে নতুন ভূমিকা গ্রহণ ক'র্‌তে পারে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উন্নতিকামী সকলেই তাই একান্ত আগ্রহভরে এই নূতন পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগারের গতিবিধি লক্ষ্য ক'র্‌বেন।

জীবিকা-সমস্যার সমাধানে গ্রন্থাগার

শিক্ষার যত রকম উদ্দেশ্যের কথাই বলা হোক্ না কেন, শিক্ষা বিজ্ঞানীরা শিক্ষার স্বরূপ সম্বন্ধে যতই চুলচেরা বিচার করুন না কেন, সমস্ত শিক্ষার সফলতার বিচার হবে জীবিকা-অর্জনে সে কতটা সাহায্য করতে পারল তাই দিয়ে। যে শিক্ষায় উপার্জনের পথ প্রশস্ত তা' যতই দুরূহ, শ্রম-সাধ্য বা বিপদসঙ্কুল হোক্ না কেন মানুষ আগ্রহ ক'রে তা শিখে থাকে। আর যে শিক্ষায় জীবিকার সংস্থান হয় না, তার গৌরব আর মাহাত্ম্য যতই বেশী ক'রে বলা হোক্ না কেন, সে শিক্ষা ক্রমান্বয়েই তার আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে।

তাই লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে তৈরী হ'তে হবে এমন ভাবে যাতে সে পাঠকদের জীবিকা-অর্জনে, আয়বৃদ্ধিতে এবং শিল্পের কৌশল আয়ত্ত করার বিষয়ে সাহায্য ক'রতে পারে। বস্তুতঃ জ্ঞানের সাহায্যে আয় বাড়্লে সেই লাভকেই মানুষ জ্ঞানের প্রত্যক্ষ ফল ব'লে কল্পনা করে। আর আমাদের দেশের গ্রন্থাগারের এ বিষয়ে প্রচুর সাহায্য করার সুযোগ ও অবকাশ আছে।

বৃত্তি ও জীবিকার বিষয়ে যারা জ্ঞান অর্জন ক'রতে চায় আমাদের দেশের সেই সব মানুষকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম, যারা বেকার অথচ সাধারণ শিক্ষিত। দ্বিতীয়, যারা কর্মে নিযুক্ত, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য অতৃপ্ত। আর তৃতীয়, যারা যে কাজ করে তা'তে তাদের দেহের বা মনের ক্ষুধা মেটে না ব'লে পরিপূরক কর্ম ক'রতে ইচ্ছুক। আমাদের দেশের প্রথম শ্রেণীর লোকদের সমস্যা আজ এত সুদূরপ্রসারী যে এদের সমস্যার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রে আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। আমাদের নেতারা

ব'ল্ছেন বেকারদের, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের সমস্যা সমাধান ক'র্তে না পার্লে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অচল হ'য়ে প'ড়্বে। তাই এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যা' যা' করা দরকার সেগুলো সব করা হ'চ্ছে কিনা সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সাবধান হওয়া দরকার।

আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিপূর্ণ পরিবর্তন ক'রে সার্জেণ্ট পরিকল্পনানুযায়ী শিক্ষা-বিস্তারের ব্যবস্থা ক'র্তে পার্লে দেশের শিক্ষা সমস্যার একটা বড় দিকের যেমন সমাধান হবে তেমনই শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও অনেকাংশে হ্রাস পাবে এটা খুবই আশা করা যায়। আমাদের দেশের যে সব ছেলেরা বৃত্তি-বিষয়ক শিক্ষা লাভ ক'রে থাকে তাদের প্রায়ই বেকার থাক্তে হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই যারা সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত তারাই বেকারীর সম্মুখীন হ'য়ে থাকে। বস্তুতঃ সব বাজারের মত শ্রম-বিক্রয়ের বাজারও চাহিদা ও সরবরাহের সামঞ্জস্যের নিয়মেই চলে। আমাদের নির্দিষ্ট সংখ্যক কেরাণী বা উচ্চ কর্মচারীর পদের জন্য এত অপরিমিত সংখ্যক সাধারণ শিক্ষিত প্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে যে অধিকাংশকে বেকার থাক্তে হ'চ্ছে বা তাদের ন্যায্য মজুরীর চেয়ে কম পেয়ে সন্তুষ্ট থাক্তে হচ্ছে। বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষালাভ কর্লে অবস্থার উন্নতি হ'তে পারে জেনেও অনেকেই সে পথে এগুতে পার্ছেন না। তার কারণ শুধু এই নয় যে বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। অনেকক্ষেত্রেই শিক্ষা পাওয়া সময়-সাধ্য এবং প্রতিষ্ঠা-সাধ্যও। তা' ছাড়া বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষালাভ ক'র্লে জীবিকা-সমস্যার সমাধান হবে ব'লে অধিকাংশক্ষেত্রেই সব চেয়ে মেধাবী ছেলেরা ঐ শিক্ষার প্রার্থী হ'য়ে দাঁড়ায়। ফলে ঐ শিক্ষালাভ কিছুটা মেধা-সাধ্যও হ'য়ে প'ড়েছে। অথচ সব ছেলেরই ত' মেধা থাকে না। যাদের মেধা নেই তারা সাধারণ শিক্ষায় সুবিধা ক'র্তে পার্বে না। যদি বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষায়ও তারা প্রবেশলাভ ক'র্তে না পারে তবে তাদের উপায় কী হবে?

বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার যে অসুবিধাগুলো আলোচনা করা গেল একটু ধীরভাবে বিচার ক'র্‌লে দেখা যাবে সেগুলো প্রতিকারের অযোগ্য নয়। চাকুরীর ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষিতেরা সকলেই একসঙ্গে কেরাণীর বা সাধারণ পরিচালকের কাজ চেয়ে এক অদ্ভুত অসুবিধার সৃষ্টি ক'রেছেন, বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষার ক্ষেত্রেও তেমনি মাত্র গোটাকয়েক নির্দিষ্ট বৃত্তির জন্য সবাই ভিড় ক'রে একই অসুবিধার সৃষ্টি ক'র্‌ছেন। প্রত্যেক বৃত্তিরই পেছনে একটা তাত্ত্বিক দিক্ আছে। অনুভবী পণ্ডিত ব্যক্তিই মাত্র তার রহস্য উপলব্ধি ক'র্‌তে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক বৃত্তির গতানুগতিক গণ্ডিবাঁধা দিকটাও উপেক্ষার নয়। বস্তুতঃ সাধারণ কর্মীর জীবনে হয়ত তত্ত্বজ্ঞানের চেয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় ধরাবাঁধা কাজগুলোর কৌশলই বেশী দরকার। তবুও উচ্চ প্রতিষ্ঠা পেতে গেলে তাত্ত্বিক জ্ঞান যে আবশ্যক একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু উচ্চপ্রতিষ্ঠা-প্রাপ্তিকে সর্বসাধারণের লক্ষ্য ক'রে তোলা শিক্ষানীতির দিক দিয়ে উচিত নয়। এই কথা আমাদের শীর্ষ-স্থানীয়রা আজ অনুভব ক'রেছেন। তাই বৃত্তিকুশলীর উচ্চতম শিক্ষাকেই বৃত্তিশিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ক'রে না রেখে তাঁরা ছোট ছোট, মধ্যবর্তী শিক্ষায়তন স্থাপন ক'র্‌ছেন। এগুলোতে প্রবেশলাভ করা বা এখানে অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়া সাধারণ ছাত্রের পক্ষে আজও অসম্ভব নয়।

সোজা কথায় বল্‌তে গেলে আমাদের দেশে বৃত্তিশিক্ষা ব'ল্‌তে ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি কয়েকটি ধরা-বাঁধা বিদ্যাশিক্ষাকেই লোকে বুঝে থাকে। ঐ কয় রকম ছাড়া যে আরও বহুরকমের বৃত্তি শিক্ষার ব্যবস্থা হ'তে পারে—এবং ঐ সব বিষয়ে যে ভিন্নমানের শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে লোকে তার খবরও রাখে না। অনেকক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানে অবৈতনিক শিক্ষানবীশ হিসাবে প্রবেশ লাভ করা হয়ত অসম্ভব নয়, কিন্তু তার নিয়ম-পদ্ধতি জানা না থাকার জন্য সে বিষয়ে

সাফল্য লাভ করা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শিক্ষিত ব্যক্তিদের কর্ম-সংস্থানের জন্য এই সব খবর সংগ্রহ ক'রে দেবার এক একটা বিভাগ স্থাপন ক'রছে বটে, কিন্তু আমাদের অগণিত ছাত্র-সমাজ, যারা মাধ্যমিক শিক্ষার পরপারে এগুতেই পার্‌ল না, তারা এ বন্দোবস্তে কী সাহায্য পায়? তাই যে সব সাধারণ গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার বাহন হয়ে গ'ড়ে উঠ্‌তে চায় তাদেরই এগিয়ে আস্‌তে হবে এই সব সমস্যার সমাধান ক'র্‌তে। প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারে বৃত্তিবিষয়ক শিক্ষালাভের সম্বন্ধে যাতে প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে। বস্তুতঃ এই কাজ ক'র্‌তে পার্‌লে গ্রন্থাগার আমাদের দেশের শিল্প-বিজ্ঞানের অগ্রগতির ঠিক ঠিক চিত্রটি লোকের সাম্‌নে ধ'রে দিতে পার্‌বে। দেশের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে লোককে জানানো যদি লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের কাজ হয়—তার যদি উদ্দেশ্য হয় দেশের ধনবিনিয়োগের সঙ্গে মানুষের শ্রমের সমন্বয় সাধনে সাহায্য করা—তার যদি দায়িত্ব থাকে দেশকে উন্নততর ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার, এবং জনসাধারণের জীবন-ধারণের মান সব দিক দিয়ে বাড়িয়ে তোলার—তা'হলে বৃত্তিবিষয়ক সংবাদ সরবরাহকে সে তার সন্ধানী বিভাগের (Reference section) বহু কাজের এক সামান্য অংশ মাত্র মনে ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারে না। তাকে বৃত্তি-বিষয়ক-সংবাদ দেবার জন্য বিশেষ আয়োজন কর্‌তে হবে। আমাদের দেশে বর্তমান গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে যাঁরা ভাল ক'রে জানেন তাঁদের কাছে পৃথক্ ক'রে এর প্রয়োজনীয়তা কেন প্রতিপন্ন করা হ'চ্ছে এ প্রশ্ন উঠ্‌বেই না।

এই রকম ক'রে জীবিকা-অর্জনের ক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌তে সাহায্য ক'রে গ্রন্থাগার তার পাঠকদের এক বিশেষ উপকার সাধন কর্‌তে পারে। একাজ লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের কর্মপন্থার অঙ্গীভূত এই দেখান হ'য়েছে। কিন্তু গ্রন্থাগারের কাজের নিঃসংশয়ে অঙ্গ হ'চ্ছে

দ্বিতীয় শ্রেণীর ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকদের সাহায্য করা; অর্থাৎ যারা কোন বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে তাদের নিজ নিজ বৃত্তির উৎকর্ষ লাভের সহায়তা করা এবং অবলম্বিত বৃত্তি দ্বারা যাদের আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ হয় না তাদের নতুন নতুন বৃত্তি অবলম্বনে সাহায্য করা।

বিভিন্ন বৃত্তিতে উৎকর্ষলাভ ক'র্‌তে হ'লে পুস্তক আজ অনেক সাহায্য কর্‌তে পারে। হার্‌গ্রীভ্‌সের যুগে তার সদ্যঃ-আবিষ্কৃত-সূত্রনির্মাণ-কৌশলকে গোপন রাখার হয়ত প্রয়োজন ছিল তার আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকে নিশ্চিত কর্‌বার জন্য, কিন্তু আজ তার কৌশলের গোপন তত্ত্বটিকে সে যদি গোপন না রেখে জগৎসমক্ষে পুস্তকের মাধ্যমে প্রকাশ ক'রে দেয় তাহলে সে আজ যুগপৎ অর্থ ও প্রতিষ্ঠা দুইই লাভ কর্‌তে পারে। তার উৎপন্ন পণ্য তাকে যে পয়সা এনে দিত পণ্য উৎপাদনের কৌশলটা নিজেও পণ্য হ'য়ে তাকে তার চেয়ে কম পয়সা এনে দেবে না। বস্তুতঃ সারা জগৎ আজ বৃত্তিতে উৎকর্ষ লাভের জন্য এত ব্যগ্র যে এ বিষয়ে সাহায্য কর্‌তে পারে এমন সামান্য কিছু খবর পেলেই সকলে তা' জান্‌বার জন্য ব্যগ্র হয়ে থাকে। তাই যাঁরা কৌশলী তাঁরা তাঁদের আবিষ্কৃত পন্থাগুলোকে পণ্য হিসাবে প্রকাশ ক'রে থাকেন। তা'ছাড়া মানুষের আবিষ্কার-ক্ষমতা একজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাই যুগে যুগে যখনই কোন দেশে কোন মানুষ নতুন কিছু আবিষ্কার ক'রে তার আবিষ্কারকে গোপন রাখ্‌তে চেয়েছে, অন্য দেশের মানুষরা অনতিবিলম্বে সে আবিষ্কারের গোপন তত্ত্ব নিজেরাও নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রেছে। তাই কোন আবিষ্কারকে গোপন ক'রে যখন রাখাই যায় না তখন গোপনীয়তার পথই অনেকে পরিত্যাগ ক'রেছেন। পেনিসিলিন আবিষ্কার যিনি কর্‌লেন, তিনি সেই আবিষ্কারের সূত্র ও তত্ত্ব গোপন ক'রে রাখ্‌লেন না। এত চেষ্টা ক'রেও এটমের তত্ত্বকে দেশবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা গেল না। বস্তুতঃ

জ্ঞান আজ সমস্ত জগতের সব রকম সীমার বাঁধনকে ভেঙ্গে চুরে দিয়ে জগৎ জুড়ে নিজের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ক'রেছে।

আবিষ্কৃত সূত্রগুলোকে গোপন ক'রে রাখার চেষ্টার ব্যর্থতা উপলব্ধি ক'রে বৃত্তিকুশলেরা যেমন তাঁদের আবিষ্কৃত সত্যকে সর্বসাধারণের গোচরীভূত ক'র্‌তে তৎপর হ'চ্ছেন, তেমনই বৃত্তিসম্বন্ধীয় মূল কথা-গুলোকে হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য ক'রে প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়ে আর এক শ্রেণীর লেখক প্রচুর পুস্তক প্রকাশ কর্‌ছেন। বস্তুতঃ এঁদের লেখনীর সোহাগার স্পর্শ পেয়েই ঐ আবিষ্কারের সোনা সাধারণ বৃত্তি-শিক্ষার্থীর ব্যবহার্য অলঙ্কার হ'য়ে উঠ্‌ছে। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে বিভিন্ন-বৃত্তি-বিষয়ক এই সব পুস্তক-প্রবন্ধের খবর রাখ্‌তে হবে—এগুলো সংগ্রহ ক'র্‌তে হবে এবং এগুলো প্রচার ক'র্‌তে হবে ঠিক্ ঠিক্ লোকের মধ্যে। অবশ্য বৃত্তির উৎকর্ষ যাঁরা কামনা করেন, তাঁদের কাছে খবরটা পোঁছে দিলেই তাঁরা এই সব পুস্তক-প্রবন্ধের পাতা ওল্টাবার চেষ্টা কর্‌বেন। কিন্তু গ্রন্থাগারের পক্ষে এইগুলোকে সংগ্রহ করা, মান হিসাবে সাজিয়ে রাখা এবং এইগুলো যাতে সহজলভ্য হয় তার ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার। এই সহযোগিতাটুকু দিতে না পার্‌লে গ্রন্থাগার লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে অসার্থক হ'য়ে উঠ্‌বে।

গ্রন্থাগারের পক্ষে অবশ্য এই কাজ ঠিক্ ঠিক্ ক'রে ওঠা সহজ নয়। তার উপর বৃত্তিও ত' অসংখ্য রকমের হতে বাধ্য; সুতরাং প্রত্যেক সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে সব বৃত্তি-বিষয়ক পুস্তকাদি সংগ্রহ ক'রে ওঠা অসম্ভব। তাই পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে যে সহ-যোগিতার উল্লেখ করেছিলাম এখানেও সেই সহযোগিতার কথাই বেশী ক'রে বল্‌তে হবে। কোন গ্রন্থাগারের পক্ষে একটা বা দুটোর বেশী বৃত্তিশিক্ষার বিষয়ের বই সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না। তাই পার্শ্ববর্তী

গ্রন্থাগারের সঙ্গে সহযোগিতা রাখ্‌তে না পার্‌লে পাঠকদের চাহিদা মেটান অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে।

বৃত্তির কৌশল আয়ত্ত কর্‌তে সাহায্য করা ছাড়া এ বিষয়ে গ্রন্থাগারের তৃতীয় কাজ হচ্ছে পাঠকদের অনুপূরক বৃত্তি অবলম্বন কর্‌তে সাহায্য করা। আমাদের দেশের অনেকেই যে কাজ করেন তাতে তাঁদের ব্যয়ের প্রয়োজন মেটে না। তাই তাঁদের অনেককে কোন না কোন বাড়্‌তি কাজ ক'রে তাঁদের নিয়মিত আয়কে বাড়িয়ে তুল্‌তে হয়। এ কথা বিশেষ ক'রে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রযোজ্য। গ্রন্থাগার কিন্তু এঁদের সমস্যা সমাধানে বিশেষ সাহায্য কর্‌তে পারে। গ্রন্থাগার খবর দিতে পারে কোথায় কীজাতীয় কাজ এঁরা অবসর সময়ে সম্পন্ন ক'রে নিজের আয় বাড়াতে পারেন। যে সব ক্ষেত্রে এই সব কাজ লেখা-পড়ার কাজ—সে সব ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার যে সাহায্য দিতে পারে তার আর সীমা নেই। কেরাণী বা মাষ্টারদের অধিকাংশকেই আমাদের দেশে এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অথচ লিখে তাঁরা কিছু যে উপায় কর্‌তে না পারেন তা' নয়। ছোটদের পাততাড়ি, আনন্দ-মেলা প্রভৃতির লোকপ্রিয়তা আমরা সকলেই দেখ্‌ছি। কোন্‌-জাতীয় লেখা কোথায় কাটে সে সম্বন্ধে সন্ধান দিয়ে-লেখা বই প্রকাশিত হয়েছে। এই বই পাঠকের সাম্‌নে তুলে ধ'র্‌লে পাঠক আপনার রুচি ও সাধ্যমত বিষয়ে লেখা আরম্ভ কর্‌তে পারে। এই লেখা শেষ করার ব্যাপারেও গ্রন্থাগারের সাহায্য করার অপরিসীম অবকাশ আছে। বস্তুতঃ যে সব অজানিত তথ্যকে জনসমাজের কাছে প্রকাশ ক'রে কোন লেখক হঠাৎ প্রসিদ্ধ হয়ে পড়েন অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সমস্ত তথ্য কোন কোষ-গ্রন্থের মধ্যে একত্র থাকে। ইতিহাসের যে ঘটনাপরম্পরা জান্‌বার জন্য মানুষের মন পরিবেশ-বিশেষে চঞ্চল হয়ে ওঠে, গ্রন্থাগারিকের নিত্য-ব্যবহার্য কোষগ্রন্থের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সে সব সংগৃহীত থাকে।

লেখার এই সব উপাদান হাতের কাছে জুগিয়ে দিয়ে গ্রন্থাগার শিক্ষিত, লেখনীকুশল লোকদের আয় বাড়াতে খুবই সাহায্য করতে পারে। বস্তুতঃ সাংবাদিক, গবেষক প্রভৃতিদের কাছে গ্রন্থাগারের যে মূল্য, লেখাকে অনুপূরক বৃত্তি হিসাবে গ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের মূল্য তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। এঁরাও ত' একজাতীয় গবেষকই বটেন।

লেখার মাধ্যমে যাঁরা আয় বাড়াতে চান গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা শুধু তাঁদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। অন্য বৃত্তি যাঁরা অবলম্বন ক'রবেন তাঁদেরও সব রকম খবরাখবর পাবার প্রধান জায়গা হবে গ্রন্থাগার। তাছাড়া ঐ বৃত্তির বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করতে হ'লেও গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কম নয়।

লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য জীবিকার্জনে সাহায্য করতে হবে একথা আগেই বলা হ'য়েছে। পুস্তকাদির সাহায্যে এই কাজ কতটা করা সম্ভব তাও খুব সংক্ষেপে আলোচনা করা হ'ল। কিন্তু এই কাজ ভাল ক'রে করতে হ'লে শুধু পুস্তক সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। পাঠককে মাঝে মাঝে জানিয়ে দিতে হবে বিপুল বিশ্বে জীবিকার কত শত পথ খোলা আছে। পড়্‌বার এবং সন্ধানী বিভাগের আয়োজন সব ঠিক্ রেখে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বৃত্তি-বিষয়ে ছবি, পরিসংখ্যান প্রভৃতি সংগ্রহ ক'রে প্রদর্শনীর আয়োজন করলে মানুষের জান্‌বার ইচ্ছাকে বাঁধা-খাতের বাইরে নিয়ে যাওয়া অনেক সহজ হবে।

যে আলোচনা করা হ'ল তার থেকেই কুটীর শিল্প প্রচলনে গ্রন্থাগার কত সাহায্য করতে পারে তার ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতঃ জীবিকা-সমস্যার সমাধান না হ'লে কোন মতেই উপযুক্ত নাগরিক গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে না। সুতরাং লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে সার্থক ও সফল হ'তে হ'লে তাকে জীবিকা-সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকতেই হবে।

অবসর-বিনোদনে গ্রন্থাগার

শিক্ষার যে সব উদ্দেশ্য স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে তার মধ্যে একটা হচ্ছে—অবসর সময়কে যথাযথভাবে ব্যয় ক'র্তে পারার যোগ্যতা অর্জন করানো। বস্তুতঃ আমাদের যত বেশী কাজই ক'র্তে হোক্ না কেন, আমরা সব সময়ই কাজ নিয়ে প'ড়ে থাক্তে পারি না। এমন কি সব সময় করার মত কাজ আমাদের অনেক ক্ষেত্রেই থাকেও না। ফলে অবসর আমাদের থাকে। সেই অবসরকে ভাল ভাবে কাটাবার উপায় তাই আমাদের ভাব্তে হয়।

অবসর সময়ে কোন কাজ না ক'রে থাকা সম্ভব নয়। মানুষ সব সময়ই কোন না কোন কাজ কর্তে বাধ্য। মানুষ ভাল কাজ কর্তে পারে, পরচর্চা, অপরের সঙ্গে অপরের ঝগড়া বাধানো প্রভৃতি খারাপ কাজ ক'রে সময় কাটাতে পারে, তাস-পাশা খেলে কি গল্পের বই প'ড়ে কালক্ষেপ কর্তে পারে, খেয়ালখুসীমত কোন আনন্দের কাজ, ইংরাজীতে যাকে Hobby বলে, তাই নিয়ে থাক্তে পারে, ঘুরে বেড়াতে পারে—কিন্তু কাজ তাকে একটা কর্তেই হবে। খুবই কম লোক আছে যারা সময় পেলেই ঘুমিয়ে কাটিয়ে সেই সময়ের সদ্ব্যবহার কর্বে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে এমন ক'রে গ'ড়ে তোলা যাতে অবসর পেলে সে সময়টা সে অপরের ক্ষতি ক'রে না কাটিয়ে সেই সময় দেশের কাজে, নিজের উন্নতির কাজে, নিজের আনন্দের কাজে লাগাতে পারে। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের এ বিষয়ে কী করণীয় আছে আর কেমন ক'রে গ্রন্থাগার তার কর্তব্য সম্পন্ন ক'র্তে পারে, এই পরিচ্ছেদে আমরা সংক্ষেপে সেই কথা আলোচনা ক'র্ব।

অবসর সময়ে আমরা যে কাজই করি না কেন, সেই কাজই যদি

আমরা ভাল ক'রে করতে চাই তা'হ'লে আমাদের তার সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞান অর্জন করা দরকার। বস্তুতঃ মানুষের সমস্ত প্রবৃত্তির মধ্যে একটা প্রধান প্রবৃত্তি হ'চ্ছে প্রতিষ্ঠা-অর্জন করা—অপরকে হারিয়ে দেওয়া, অপরের চেয়ে ভাল ব'লে নিজেকে প্রতিপন্ন করা। এই ইচ্ছা সব রক্ত-মাংসে-গড়া মানুষের মনে মনেই থাকে। তবে কেউ হয়ত ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে—কেউ করে না। আমাদের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বড় হবার এই প্রবৃত্তির মূলে ইন্ধন জুগিয়ে একে জোরালো ক'রে তোলা—মানুষের সম্ভাবনাকে পরিণতির পথে এগিয়ে দেওয়া, তাকে ঠিক ধারায় সচেষ্ট ক'রে তোলা। তাই খেলা-ধূলার থেকে আরম্ভ ক'রে লেখা-পড়া, গান-বাজনা সর্বত্র সব ক্ষেত্রে আমরা মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতার আয়োজন ক'রে থাকি। সামাজিক মানুষের মনের মাঝেই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি সুপ্ত হ'য়ে থাকে—প্রতিযোগিতার দণ্ড-প্রহারে আমরা তাকে জাগিয়ে তুলি।

মানুষের এই আত্মপ্রতিষ্ঠার তাগিদেই মানুষকে প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ক্ষেত্র খুঁজে নিতে হয়। ক্লাসে পড়াশুনায় কোন ছেলেকে হারাতে পার্‌লুম না, তখন তাকে হারাবার জন্য ছবি আঁক্‌তে শিখ্‌লুম, গান গাওয়া অভ্যাস ক'র্‌লুম, বা খেলার মাঠে আধিপত্য বিস্তার ক'র্‌লুম। বাস্তবিক কর্তব্য ও প্রয়োজনের সীমাবদ্ধ. ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন কর্‌তে পারে না বলেই মানুষ hobby তৈরী ক'রে তার কৌশল প্রয়োগের নতুন ক্ষেত্র আবিষ্কার ক'রে নেয়—যেখানে সে অনেক ক্ষেত্রেই অপরের-ঠিক্-ক'রে-দেওয়া কর্তব্যের ক্ষেত্রে বিজয়ীদের পরাজিত করার গৌরব, আনন্দ ও সম্মান লাভ করে।

বাস্তবিক মানুষের. উন্নতির পথ, আত্মবিকাশের পথ যে সঙ্কীর্ণ নয়—তা' যে বিচিত্র তা' যে বহুমুখী এটা আমাদের মনে প'ড়ে যায় যখন আমরা অবসর-বিনোদনের রাজ্যে আসি। মানুষ যেটা পারে, সেটায়

তার রুচি জন্মে। মানুষের যাতে রুচি জন্মে সেটা সে পারে। তাই সফলতা ও ভাল লাগার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধের মধ্যে মানুষের অবসর-বিনোদনের উপায় আবিষ্কৃত হয়। যার জীবনে অবসর-বিনোদনের ঠিক রাস্তাটা আবিষ্কৃত হ'ল না, বুঝ্‌তে হবে সে ভাল-লাগার বিভিন্ন বিচিত্র রাজ্যে বিচরণ করে নি', দেখে নি' পরীক্ষা ক'রে এর মধ্যে কোন্‌ রাজ্যটি তার কাছে ধরা দেবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ব'সে র'য়েছে। শিক্ষাকালের মধ্যেই মানুষকে আবিষ্কার ক'রে নিতে হবে তার এই আপন রাজ্যটা। যতদিন এটা আবিষ্কৃত না হবে ততদিন অবসর কাল হবে ভার মাত্র—আত্মতৃপ্তির নতুন সুযোগ সে ততদিন এনে দিতে পার্‌বে না। কর্তব্যের ভারবাহী পশু মাত্র হ'য়ে ততদিন মানুষকে বিচরণ ক'র্‌তে হবে। তাই শিক্ষার অন্যতম প্রধান কর্তব্য অবসর-বিনোদনের সার্থক পন্থা আবিষ্কার করার যোগ্যতা অর্জন করানো।

তা' ছাড়া আজকের দিনে অবসর-বিনোদনের মধ্য দিয়ে মানুষের অর্থার্জনের নতুন নতুন পথও খুলে যায়। লেখাপড়ার কাজ ভাল লাগে ব'লেই অবসর সময়ে লিখ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লুম। নিরলস চর্চার জন্য লেখার উন্নতি হ'তে লাগ্‌ল। তারপর একদিন ঐ লেখাই আমার উপার্জনের পণ্য হ'য়ে উঠ্‌ল। নিছক আনন্দের জন্য গান আরম্ভ ক'রে মানুষ শিল্পী হ'য়ে ওঠে। তার পর পয়সা আর প্রতিষ্ঠা জোর ক'রে এসে তাকে আশ্রয় করে। ফুলবাগানের সখের জন্য ফুল তৈরী করা হ'ল। সখের জন্যই ফুলকে আরও ভাল করার চেষ্টা চ'ল্‌তে লাগ্‌ল। তার পরে একদিন সেই ফুল এনে দেবে যথেষ্ট পয়সা। ডাকটিকিট সংগ্রহ আরম্ভ করা গেল। দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য ডাকটিকিট ব'লেই বিশেষ ক'রে হয়ত কোনটা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হ'ল না, কিন্তু তবুও সংগ্রহ দিনের পর দিন যত বাড়্‌তে লাগ্‌ল, যত ভাল হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, দেখা গেল সেই সংগ্রহের মধ্যে ততই জমা হ'য়ে গেছে এমন সব টিকিট

যেগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। ঐ রকম টিকিট অসম্ভব বেশী দামে বিক্রী করার সুযোগও এসে থাকে। ফল কথা, সময় কাটাবার নতুন নতুন পন্থাগুলোর প্রধানতঃ আনন্দ দেবার দায়িত্ব থাক্‌লেও অনেক সময় এগুলো আনুষঙ্গিকভাবে অর্থার্জনেও সাহায্য ক'রে থাকে।

তাই অবসর-বিনোদনের জন্য যে কাজকেই আমরা বেছে নিই না কেন, চাই তাতে উৎকর্ষ লাভ ক'র্‌তে, প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'র্‌তে। সুখের বিষয় যাঁরা এ সব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে গেছেন তাঁরা অনেক সময়ই নিজেদের সাফল্য লাভের উপায় সকলকে জানাবার জন্য সেগুলো লিপিবদ্ধ ক'রে রেখে গেছেন। তাই ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্ থেকে সুরু ক'রে তাস, দাবা খেলার বিষয়ে পর্যন্ত আজ বইয়ের সংখ্যা কম নয়। পাখীপোষা, মাছধরা, টিকিট-সংগ্রহ, বাগান-করা সব বিষয়েই কৃতী ব্যক্তিদের পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণ আজ পুস্তকের অঙ্গীভূত। তাই গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হ'তে হয় অনেককে, যাঁরা তাঁদের অবসর-বিনোদনের ঠিক্ পথটি খুঁজে পেয়েছেন এবং সেই পথে নতুন নতুন আনন্দ লাভের জন্য সচেষ্ট হ'য়েছেন। গ্রন্থাগার এই সব লোকদের বই দিয়ে সক্রিয় সাহায্য করতে পারে। বই সংগ্রহ ক'রে দিতে না পার্‌লেও অন্ততঃ কাজের বইয়ের খবর দিয়েও সহযোগিতা কর্‌তে পারে। গ্রন্থাগারের এই বিষয়ে দায়িত্ব আজ সব দেশে স্বীকৃত হয়েছে। বস্তুতঃ তাই আজ গ্রন্থাগারকে ছবি আঁকার বা গানের শুধু তত্ত্বগত আলোচনার বই সংগ্রহ কর্‌লেই চলে না—গ্রন্থাগারকে সংগ্রহ কর্‌তে হয় ভাল ভাল ছবি, ভাল ভাল গানের রেকর্ডও।

আমাদের দেশের কেরাণী-গড়া শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে কোন ছেলেই নিজের অবসর-বিনোদনের ঠিক পথটিকে চিনে নিতে সাহায্য পায় নি'। তাই আমাদের দেশের অবসর-বিনোদনের পন্থা খুবই সঙ্কীর্ণ, সাধারণতঃ ব'সে ব'সে বা ছুটে ছুটে খেলা আর গল্পের বই পড়ার মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ।

মেয়েদের ক্ষেত্রে সেলাই করা, গান গাওয়া বা পত্রচর্চা করার পথও অবশ্য খোলা আছে। যাত্রা-থিয়েটার দেখা, ধর্ম-কথা শোনাকে ঠিক অবসর-বিনোদনের পর্যায়ে ফেলা যায় কিনা জানি না—যদি যায় তবে ওকেও এর অন্তর্ভুক্ত করলেই আমাদের অবসর-বিনোদনের সবগুলো পন্থার পরিপূর্ণ তালিকা দেওয়া হ'য়ে গেল। খেলাধূলা, সেলাই, গান, অভিনয় বা ধর্ম সম্বন্ধে যথেষ্ট বই থাকলেও গতানুগতিক প্রথায় ওগুলোকে আমরা গ্রহণ করি ব'লে ওগুলোতে খুব বেশী কৃতিত্ব অর্জনের চেষ্টা আমাদের থাকে না। ফল কথা, ওগুলোতে আমাদের ওগুলোর জন্যই অনুরাগ জন্মে না। ওগুলো শুধু আমাদের কাছে শিক্ষণীয় বিষয়ে সময় কাটাবার সাধন মাত্র হ'য়ে থাকে। ওদের প্রতি বেশী অনুরাগ জন্মালে ওগুলোর বিরুদ্ধে অভিভাবক থেকে সুরু ক'রে সকলের নিন্দাবাদের মধ্যে সে অনুরাগের লয় পেতে বেশী দেরী হয় না। সুতরাং ওগুলোতে উৎকর্ষ লাভ ক'রে যে কোন লাভ আছে তাও আমরা বুঝি না—ফলে ও বিষয়ে খুব এগোতেও পারি না।

তাই আমাদের দেশে কি প্রচলিত কি অপ্রচলিত অবসর-বিনোদনের সব রকম পন্থাকেই পুনরুজ্জীবিত করার দরকার আছে। প্রচলিত অবসর-বিনোদন-পদ্ধতিগুলোকে আমাদের অবশ্য-করণীয় কাজের সঙ্গে যথাযথভাবে সুসমঞ্জস করে তোলার প্রয়োজন আছে। নতুন নতুন অবসর-বিনোদন-পদ্ধতি সকলকে জানিয়ে দেবার, সেগুলো অভ্যাস করবার উপায় শেখানোরও প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে যে ব্যবস্থাই করা যাক্ না কেন, লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার যে এ বিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ ক'রতে পারে এ কথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থাগারকে অবসর-বিনোদনের নানা পন্থা লোকসমক্ষে জানিয়ে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে। এ বিষয়ে বিভিন্ন সভা বা আলোচনার আয়োজন ক'রে প্রদর্শনীর বন্দোবস্ত ক'রলে খুব সুফল ফলতে পারে

ব'লে আমার বিশ্বাস। কয়েকজন বিশেষজ্ঞের প্রয়োজনের খাতিরে আমাদের গ্রন্থাগারগুলো এই রকম সভার আয়োজন ক'রেই থাকে। যদি সর্বসাধারণের প্রয়োজনের দিকে তাকানো যায় তবে এই রকম সভা ও প্রদর্শনীর প্রয়োজন প্রতিপন্ন করার জন্য খুব বেশী যুক্তি দেবার দরকার হবে না। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারিক শিক্ষাপ্রচারের পুরোহিত। মানুষের উন্নতির জন্য যত সমস্যা আছে সবগুলোর সমাধানে সাহায্য করার দায়িত্ব তাঁর আছে। অবসর-বিনোদনের নতুন নতুন শিক্ষা মানুষের বাড়্তি সময়ের যে সমাধান করতে পারে, সে শিক্ষাপ্রচারের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিক অস্বীকার ক'র্তে পারেন না।

কিন্তু এই রকম প্রদর্শনী বা আলোচনাকে সার্থক ক'রে তুল্তে হ'লে একসঙ্গে বহু বিষয়ের সমাবেশ করা উচিত হবে না। অবসর-বিনোদনের একটি মাত্র পন্থা সম্বন্ধে একবারে আলোচনা করা হবে। সেই বিষয়েই দেখান হবে ছবি, পরিসংখ্যান। তারই ইতিহাস, ক্রমোন্নতি, তারই লোকপ্রিয়তা, প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করার ক্ষমতা, অর্থার্জনে সাহায্যের সম্ভাব্যতা প্রভৃতি বিষয় প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত করা হবে। ফল কথা, ঐ বিষয় লোকের মনে যাতে দাগ কাটতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। বড় লোকের বাড়ীর ভোজের মত আয়োজন-বাহুল্যের মধ্যে উপকরণের রসকে বিলুপ্ত ক'রে না ফেলে একটা মাত্র বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিয়ে ঐ প্রদর্শনীকে সার্থক ক'রে তুলতে হবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমার একটা সাধারণ অভিজ্ঞতার এখানে উল্লেখ কর্ব। যে অঞ্চলের কথা বল্ছি সেখানে ছোটদের খবরের কাগজ পড়ার উপর খুব বেশী জোর দেওয়া হ'ত না। সেখানকার একটি ছেলে কয়েকটি লেখা খাতা জোগাড় করে। সেই লেখা খাতাগুলোর একটায় 'বড় বড় জননেতা', একটায় 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক', একটায় 'পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক', একটায় 'বড় বড় খেলোয়াড়' শিরোনামা লিখে রাখে। আর পুরানো

খবরের কাগজ থেকে ছবি কেটে নিয়ে এই খাতাগুলোকে ভ'রে ফেলে। প্রত্যেক ছবিটার নিচুতে, যার ছবি তার জীবনীর প্রধান প্রধান দু'টো একটা কথা, জন্ম-তারিখ প্রভৃতি লিখে রাখে। ছেলেটার খাতাগুলো দেখে আমার খুব ভাল লাগ্‌ল। স্কুলে তার ক্লাসের অনেক ছেলেকেই তার খাতাগুলো দেখালাম। তার পর অনেক ছেলেই তাকে অনুকরণ ক'রেছিল। এক্ষেত্রে প্রথম ছেলেটা শিক্ষা, আনন্দ ও প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই পায় নি'। অথচ তার এই প্রাপ্তিই অপরকে অনুপ্রাণিত ক'রেছিল তাকে অনুকরণ করার। যদি আমরা এই সঙ্গে অর্থপ্রাপ্তির কথাও ব'ল্‌তে পার্‌তাম তা' হ'লে ফল কি আরও ভাল হ'ত না?

ফল কথা, গ্রন্থাগারকে দায়িত্ব নিতে হবে নতুন নতুন অবসর-বিনোদনের পন্থা শেখাবার। তা' যদি গ্রন্থাগার না পারে তবে কাহিনীর বই পড়ার বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ করার কোনই মানে হবে না। আমাদের দেশে একা একা অবসর কাটাবার যে ক'টা পথ প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে অধিক অনুসৃত পথ হ'চ্ছে গল্পের বই পড়ার পথ। বস্তুতঃ পাড়াগাঁয়ের অনেক গ্রন্থাগার গ'ড়ে ওঠে বিবাহের-উপহারে-দেওয়া গল্পের বইগুলো সংগ্রহ ক'রে। পাঠকের বিপুল অংশই গ্রন্থাগারের কাছে প্রধানতঃ চায় গল্পের বই। তাই কোন দেশের সাহিত্যের খোঁজ নিলে দেখা যায় তার গল্প বা কাহিনীর বইয়ের সংখ্যা অন্য সব জাতীয় বইয়ের সমষ্টির চেয়েও বহুগুণ বেশী। স্কুলের ছেলে থেকে আরম্ভ ক'রে পলিতকেশ বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই গ্রন্থাগারের দ্বারস্থ হ'য়ে প্রথমেই দাবী ক'রে থাকেন গল্পের বইয়ের।

গ্রন্থাগার আমাদের দেশে এখনও প্রধানতঃ অবসর-বিনোদনের সাধন। তাই গল্পের বইয়ের চাহিদা এখানে হবে, এ আর আশ্চর্য কী? অথচ অনেক জায়গায়ই দেখি পাঠকরা গ্রন্থাগারে এসে গল্পের

বই পড়েন এ আমাদের দেশের শিক্ষাকামীদের চক্ষুঃশূল। তাঁরা গল্পের বই পড়ার উপর নানাধরণের বিধিনিষেধ আরোপ করার চেষ্টা করেন।

গল্পের বই পড়ার বিরুদ্ধে তাঁদের কথা হচ্ছে, গল্পের বই মানুষের জ্ঞান বা চিন্তাশক্তি বাড়ায় না, আমাদের জীবন-সংগ্রামে গল্পের বই কোন সাহায্য করে না। তাই গল্পের বইয়ের পেছনে যে সময় ও অর্থব্যয় করা হয় তা' নিছক অপব্যয় মাত্র।

গল্পের বইয়ের বিরুদ্ধের যুক্তিগুলো বিচার কর্‌বার আগে আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে গ্রন্থাগার অবসর-বিনোদনের নানা বিকল্প-পথ দেখিয়ে দেওয়া ছাড়া গল্পের বই পড়ার বিরুদ্ধে কোন পন্থা অবলম্বন কর্‌তে পারে না। গ্রন্থাগারিক দোকানী মাত্র—সে অভিভাবকও নয় মাষ্টারও নয়। মাষ্টার বা অভিভাবকরা, ইচ্ছা হয়তো, নজর রাখুন পাঠক গ্রন্থাগারে যেয়ে যেন গল্পের বই না চায়। কিন্তু আমরা গ্রন্থাগারিকেরা আমাদের পসরার মধ্যে নানা জিনিষের সঙ্গে গল্পের বইও সাজিয়ে রাখ্‌ব। লাল লাল লজেঞ্চুস্‌ ছেলেদের বই-কাগজ-পেন্সিলের চেয়ে বেশী প্রিয়—আর ঐগুলোই ছেলেদের দোকানে টেনে আনে। এই জেনে দোকানী যেমন পসরার সাম্‌নেই সাজিয়ে রাখে তার বিস্কুট, লজেঞ্চুসের বোয়েম, আমরা গ্রন্থাগারিকেরাও তেম্‌নি পাঠককে গ্রন্থাগারে টেনে আন্‌বার জন্য সাম্‌নে সাজিয়ে রাখ্‌ব টাটকা-বের-হওয়া, সাজানো প্রচ্ছদপটের, নাম-করা, আকর্ষণীয় গল্পের বই। পেছনে থাক্‌বে আমাদের গুরুগম্ভীর বইগুলো। গুরুগম্ভীর বইয়ের যারা সন্ধানী, তারা পেছনে খোঁজ কর্‌তেও পেছপা হবে না। কিন্তু যারা গ্রন্থাগারের পথে পা'ই বাড়াবে না তাদের আন্‌বার জন্য আকর্ষণীয় গল্পের বইয়ের পসরা ছাড়া আর কী কার্যকরী হয়ে উঠ্‌বে?

গল্পের বইয়ের বিরুদ্ধে যত কথা বলা হয় সব কথাই কি পুরোপুরি ঠিক্? ডিকেন্সের উপন্যাসই নাকি ইংলণ্ডের শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আন্‌বার

অন্য লোকদের সচেতন করে তুলেছিল। ভিক্টর হ্যুগো নাটক-কাহিনীর রক্তচন্দন দিয়েই ফরাসী বিপ্লবকে বরণ করে এনেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ আমাদের শহীদদের আত্মবলিদানের মন্ত্র জুগিয়েছে। শরৎ-চন্দ্রের উপন্যাস সমাজ-সংস্কারের প্রয়োজন প্রতিপন্ন করতে কম সাহায্য করে নি। মোট কথা, ভাল গল্পের বই পড়ার গুণ অনেক। এ মানুষের মনকে অপরের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ করে তোলে, মানুষকে চিন্তাশীল ক'রে তোলে, সমাজের দোষত্রুটিগুলো দূর করতে সাহায্য করে, মানুষকে আদর্শবাদী ও উন্নত করে। এ সব যদি নাও করত তবুও অবসর সময় অপরের ক্ষতি না ক'রে যাপন করার উপায় হিসাবেও গল্পের বই পড়ার মূল্য কম হ'ত না। তাছাড়া নতুন পাঠক ধরার কাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গল্পের বইই প্রধান সাধন। গ্রন্থাগারিকের চোখে গল্পের বইয়ের মূল্য কম হ'তে পারে না।

একথা মনে রাখ্‌তে হবে অবসর বিনোদনের অন্য যত পথই থাক্ না কেন—বই পড়া ঐ সব পথ অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক সাহায্য করতে পারে মাত্র। সুতরাং গ্রন্থাগারের ঐ সব ক্ষেত্রে অনেক কিছু করার থাক্‌লেও গল্পের বই পড়াকে এ কখনও নিরুৎসাহিত করতে পারে না।

অবসর বিনোদনের বিচিত্র ও বিবিধ পথের আলোচনার উপসংহারে বল্‌তে হয় পৃথিবীর অধিকাংশ লোক গবেষণা বা লেখাপড়া নিয়ে থাকে না। বেশী সময়ই কাটে তাদের পেটের ধান্ধায়। ঐ সব লোকদের সামান্য অবসরকে আনন্দময় ও মধুর করে তোলার চেষ্টা না ক'রে—যদি গ্রন্থাগার ওদের ভাল করতে চায়, তবে সে চেষ্টা কখনও সার্থক হ'তে পারে না। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে জনসাধারণের অবসর বিনোদনের সহায়ক হতে হবে।

নাগরিক গঠনে গ্রন্থাগার

বর্তমানকালে অধিকাংশ দেশেই গণতন্ত্র-সম্মত শাসন-ব্যবস্থাকে আদর্শ ব'লে মনে করা হয়। বস্তুতঃ ফরাসী বিপ্লবের পর থেকে যে দাবী দেশে দেশে উদ্‌ঘোষিত হ'য়ে চ'লেছে তা' হ'চ্ছে জনসাধারণের মঙ্গলার্থে জনসাধারণের দ্বারা পরিচালিত জনসাধারণেরই রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দাবী। একনায়কতার অধীনতা থেকে মুক্ত হবার উদগ্র বাসনা প্রজ্বলিত বহ্নির মত দেশ থেকে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রপরিচালনের দায়িত্ব যে দিন থেকে জনসাধারণ গ্রহণ করতে চেয়েছে সেই দিন থেকেই স্বতঃই যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেছে। জনসাধারণের রাষ্ট্রশাসন তখনই সফল হ'তে পারে যখন জনসাধারণ যোগ্যতা অর্জন করে। জনসাধারণ যদি যোগ্যতা অর্জন না করে, তারা যদি সচেতন না থাকে তবে দুরাকাঙ্ক্ষী নেতার পরিচালনায় দেশবাসী কখনই সুস্থ থাকতে পারে না। গণতন্ত্র-ব্যবস্থায় শাসন-পরিচালনার সবটুকুই নির্ভর করে জনসাধারণের ভোটের উপর। যে দল যেমন ক'রেই হোক জনসাধারণের ভোটে প্রতিনিধি-গোষ্ঠীতে সংখ্যাধিক্য লাভ করতে পারে সেই দলই শাসন-যন্ত্র পরিচালনার সুযোগ পায়। সুতরাং দেশের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করে ঠিকভাবে ভোট দিয়ে শাসনযন্ত্র-পরিচালনার জন্য ভাল দল নির্বাচনের উপর। এই ভাল দল নির্বাচন ক'রতে হ'লে জনসাধারণকে প্রত্যেক দলের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি জানতে ও বিচার করতে হয়। বলা বাহুল্য, নির্বাচনী প্রচারসভাগুলোর বক্তৃতা শুনে এই জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্জন করা যায় না। এর জন্য জনসাধারণকে রাজনৈতিক-মত-নিরপেক্ষ সাধারণ জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্জন ক'রতে হয়।

নিজের দেশের ইতিহাস ও সমস্যাগুলো জানা তাই নাগরিকদের

পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন—এই সমস্যাগুলোকে কোন্ দল কেমন ক'রে বুঝেছে ও কেমন ক'রে সমাধান করতে চাইছে। এ শিক্ষা নির্বাচনের পূর্বে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে লাভ করা যায় না। এ শিক্ষা পেতে হ'লে ধীরে ধীরে প্রতিদিনের ঘটনাপরম্পরা লক্ষ্য করা দরকার। এই জন্যই সমস্ত অগ্রগামী দেশগুলোতে খবরের কাগজ পড়ার এত বেশী প্রচলন আছে।

খবরের কাগজ প'ড়ে নিজেদের চেষ্টায় দেশ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা সংগ্রহ করা খুব সহজ কাজ নয়। এইজন্যই দেশের বিভিন্ন দিক্ সম্বন্ধে অবস্থা ব্যাখ্যা ক'রে নানা প্রবন্ধ সম্পাদকীয় আকারে বের করা হ'য়ে থাকে। কিন্তু খবরের কাগজের এই প্রবন্ধগুলো প্রতিদিন প্রকাশিত নতুন নতুন প্রবন্ধের তলায় চাপা প'ড়ে যায় এবং ঠিক্ সময় মত এদের খুঁজেও পাওয়া যায় না। তাই বর্ষপঞ্জী, ইতিহাসের বই এইগুলোর প্রয়োজন হয় কোন বিষয়ের সমস্ত বিবর্তনকে একত্র ক'রে প্রকাশ করবার জন্য। গ্রন্থাগার দলমত-নিরপেক্ষ ভাবে এই রকম সব বইয়েরই সংগ্রহ করে ব'লে গ্রন্থাগারের সাহায্যেই জনসাধারণের পক্ষে রাষ্ট্রের ও সব দলগুলোর সঠিক অবস্থা জানা সম্ভব হয়।

ভোট দেবার যোগ্যতা অর্জন ব্যতীত ভাল নাগরিকদের আরও অনেক দায়িত্ব আছে। বিদেশী সরকারের অনিচ্ছুক জনগণকে জোর ক'রে শাসনে রাখতে হয়। শান্তিরক্ষাই হয় এই সরকারের প্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু যে রাষ্ট্রব্যবস্থা আজ আমরা চাই তা' তো কখনই বিদেশী সরকারের অধীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থা নয়। সে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা আমাদের নিজেদেরই। তাই তার প্রতি পদক্ষেপের সার্থকতা পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করবে আমাদের নিজেদের সহযোগিতার উপর। শুধু অভাব অনুভব করলে লাভ হবে না, অভাবের জন্য রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে দোষ দিলেও লাভ হবে না। অভাব দূর করবার জন্য আমরা সক্রিয়ভাবে যদি রাষ্ট্রের সঙ্গে

সহযোগিতা করি তবেই আমাদের রাষ্ট্র আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করতে হ'লে প্রধান দরকার রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থাকে জানা ও বোঝা।

এই কাজ কিন্তু এত সহজ নয়। শিক্ষার অভাবের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক বাধা আমাদের এই জানা ও বোঝার প্রতিবন্ধক হয়ে আছে। বিশেষ ক'রে আমাদের বাংলা দেশের সম্বন্ধে একথা প্রযোজ্য। আমরা কখনও রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করার, রাষ্ট্রকে নিজের বলে ভাবার শিক্ষা পাই নি। ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন অনুসারে যখন আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য—বিহার, আসাম, যুক্তপ্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ) প্রভৃতিতে চিন্তাশীল জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'ল—তখনও বাংলাদেশে প্রতিক্রিয়াশীল সরকার র'য়ে গেল। যখন ওসব প্রদেশের সংবাদপত্র, নেতৃবৃন্দ প্রভৃতি সকলে জনসাধারণকে রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতার শিক্ষা দিতে লাগলেন, তখনও বাংলাদেশে প্রয়োজন রইল সরকারের অন্যায় কাজগুলোর প্রতিবাদ করার। তাই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার শিক্ষা বাংলাদেশে আরম্ভ হয়েছে অনেক দেরীতে। এখনও আগেরই মত আমরা অনেকে সরকারী মতের ও কর্মধারার প্রতিবাদ করাকেই বাহাদুরী ব'লে মনে করি। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে, যে শিক্ষা আরম্ভ করতে আমাদের দেরী হয়েছে সেই শিক্ষা আমাদের ত্বরান্বিত ক'রে, সম্পূর্ণ করতে হবে। এটা কোন রাজনৈতিক দল বা মতকে সমর্থনের কথা নয়। এটা সাধারণ দেশপ্রীতি ও শৃঙ্খলাবোধের কথা। যে দলই দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে করায়ত্ত করুক না কেন, দেশের অধিকাংশের সমর্থনেই করবে। সুতরাং তাদের কাজে সহযোগিতা করা মানে দেশের অধিকাংশের মতকে শ্রদ্ধা করা। এই অধিকাংশের মতের সঙ্গে নিজের মতকে মানিয়ে নিয়ে চলা হ'চ্ছে গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থা-ভোগের প্রথম সর্ত। তাই গণতন্ত্রসম্মত রাষ্ট্র-

ব্যবস্থাকে সফল ক'রে তুলতে হ'লে এই রাষ্ট্রযন্ত্র যাঁদের করায়ত্ত তাঁদের সঙ্গে সহযোগিতা ক'রে তাঁদের অনুসৃত পন্থার সার্থকতা আছে কিনা তা' পরীক্ষা করার সুযোগ দিতেই হবে। এ সুযোগ না দিয়ে বিদেশী শাসনকে বিপর্যস্ত করা যায়—নিজের শাসনযন্ত্রকে সবল ক'রে তোলা যায় না।

আমাদের বাংলাদেশে সরকার ও জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব প্রধানতঃ গ্রন্থাগারই নিতে পারে। রাজনৈতিক প্রচারকে জনগণ সব সময় উদ্দেশ্যমূলক ব'লেই বুঝে থাকে। তাই তাদের আক্রমণ বা সমর্থন কোনটারই খুব একটা মূল্য দেওয়া কঠিন। দেশ-বিদেশের ইতিহাস থেকে গ্রন্থাগার বুঝিয়ে দিতে পারে রাষ্ট্র ও জন-সাধারণের সহযোগিতা অন্যান্য দেশে উন্নতিকে কত ত্বরান্বিত করেছে। আমাদের দেশে একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রায় শেষ হয়ে এল। আর একটাও সুরু হ'তে চলেছে। কিন্তু আরও বেশী জনসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রদত্ত সহযোগিতা কি একে আরও বেশী সার্থক করে তুলতে পারত না? এ কথা বললে কখনই ভুল হবে না যে, জনসাধারণের অনেকেই এই পরিকল্পনাগুলোর তাৎপর্য ও তাতে তাদের করণীয় কী এটা ভাল ক'রে বুঝতে পারে নি। জনসাধারণের ছোট ছোট পঞ্চায়েৎ বা সঙ্ঘ যত গ'ড়ে ওঠা উচিত ছিল এই সব কাজকে সাহায্য করার জন্য তা' সেই জন্যই গ'ড়ে ওঠে নি।

গ্রন্থাগারগুলো এই সমস্তকে আপন আপন এলাকায় প্রচার করার ও বুঝিয়ে দেবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই নিতে পারে। তার বইও আছে—চিন্তাশীল লোকদের মেলাবার বন্দোবস্তও আছে। শুধু বইগুলোকে বেছে নেওয়া দরকার, আলোচনা ক'রে বুঝিয়ে বলার মত লোকের দরকার, ছায়াচিত্র প্রভৃতি দেখাবার জন্য সরকারী প্রচার বিভাগের সহায়তা দরকার। বস্তুতঃ যতদিন সরকারকে আমাদের মনে ক'রে আমরা সেই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত না হই ততদিন আমরা নাগরিকের দায়িত্ব পালন করতে পরাঙ্মুখ থাকি।

ভোট দেওয়া আর রাষ্ট্রের উন্নতিকর পরিকল্পনার সঙ্গে সহযোগিতা করা ছাড়াও নাগরিকদের দায়িত্ব নিতে হয় জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি স্থানীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার।

এগুলোকে ভাল ক'রে পরিচালিত করতে হ'লে এগুলো পরিচালনের সাধারণ নীতি, স্থানীয় সমস্যাগুলো এবং ঐ সমস্যার অন্যত্র কেমন ক'রে সার্থকভাবে সমাধান করা হয়েছে সেই উপায় জানা দরকার। এই সব জানার ব্যাপারে গ্রন্থাগার যে খুবই সাহায্য করতে পারে সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান নিয়মগুলো জানা ও মানা সব নাগরিক জীবন-যাপনের প্রধান কথা। সমাজবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে হ'লে অপরের অসুবিধা না ক'রে কেমন করে নিজে স্বচ্ছন্দভাবে থাকা যায়, এটা আমাদের শিখতেই হবে। অথচ আমাদের এই শিক্ষায়-পশ্চাৎপদ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশে একাজ খুব সহজ কাজ নয়। বাড়ীর নোংরা কাপড় সাধারণের পুকুরে কাচা নিয়ে ঝগড়া-হওয়া আমাদের দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষার অভাবই কি এর মূল কারণ নয়? পুকুর থেকে জল তুলে নিজের কাজ করার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য আমি যদি সাধারণের পুকুরের জল নষ্ট করি, ঐ পুকুরের জল ব্যবহার ক'রে ফের আমারই কি বিপদ ঘটতে পারে না? বস্তুতঃ স্বাস্থ্যরক্ষার এই সব সাধারণ কথাগুলো প্রদর্শনী, ছায়াচিত্র প্রভৃতি মারফৎ জনগণকে বুঝিয়ে দেবার গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোন্ প্রতিষ্ঠান আমাদের আছে? টীকা নেবার সম্বন্ধে লোকের মনে এখনও যে সব ভুল ধারণা আছে তা' দূর করতে হ'লেও ঐ সব প্রদর্শনী কম সাহায্য করবে না।

আমাদের দেশের লোকদের মধ্যে নতুন আদর্শ প্রচারের জন্যও গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কম নয়। দেশে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব এসে পড়েছে। বস্তুতঃ জার্মানী,

ইংলণ্ড, আমেরিকার কেরাণী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক কেউই এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চান নি। কিন্তু আমাদের দেশের জনসাধারণ, ছাত্রসমাজ কেউই ত' তেমন আগ্রহ ক'রে সামরিক শিক্ষা নিতে এগিয়ে আস্‌ছেন না। বাঁধাধাতের কেরাণী জীবনের বাইরে নতুন শিল্প-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার দিকেই বা আমাদের লোকদের নজর কই? দেশ-বিদেশের দৃষ্টান্ত বার বার নানাভাবে লোকের সামনে উপস্থিত ক'রে নতুন আদর্শে আমাদের জনসমাজকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুল্‌তে না পার্‌লে আমাদের দেশে কেমন ক'রে বারকেনহেডের বীরেরা জন্মাবে, কেমন ক'রে ক্রিমিয়ার লাইট্‌ ব্রিগেড্‌ গ'ড়ে উঠ্‌বে? কিন্তু এ আদর্শ প্রচারের ব্রত গ্রহণ কর্‌বার সার্থক ও সবল প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারের চেয়ে আর কী হ'তে পারে?

যাঁরা বিদেশ থেকে আসেন তাঁদের মুখে প্রায়ই শুনি ও-দেশের লোকদের নাগরিক কর্তব্যবোধ এত যে সাধারণের স্নানাগারেও সাবান, তোয়ালে পর্যন্ত চুরি যায় না। খবরের কাগজ, বিক্রেতার অনুপস্থিতিতেও, ঠিকই বিক্রী হয়, পয়সার কোনও গোলমাল হয় না। কেউ রাস্তায় ফলের খোসা, ছেঁড়া কাগজ ফেলে না। কিন্তু শুধু ওদেশের গুণগান না ক'রে যদি আমরা এই সব সদ্‌গুণ আমাদের দেশে সঞ্চারিত কর্‌তে চাই তাহ'লে আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে একযোগে আমাদের দুষ্টক্ষতগুলো কোথায় এবং তা' সমাজের কত ক্ষতি কর্‌ছে সেকথা জনসমাজের সাম্‌নে জানিয়ে দিতে হবে। কিন্তু আমাদের দেশে এ রকম প্রতিষ্ঠান বেশী আছে কি? আগে নানা উপলক্ষে বিভিন্ন জায়গায় মিছিল আর সং বেরোত। সেই সব সংয়ের কাজ ছিল সমাজের অন্যায়গুলোকে ব্যঙ্গের মাধ্যমে লোক-চক্ষুতে হেয় ক'রে তোলা। কিন্তু যে জন্যই হোক্‌ এই সব সংগুলো ক্রমান্বয়ে লোপ পাচ্ছে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগার প্রদর্শনীর মারফৎ আর দেশ-বিদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে আলোচনার মাধ্যমে বা ঐ বিষয়ে পুস্তকাদি

প্রচার ক'রে যা' করতে পারে এ বিষয়ে এখন তাইই আমাদের একমাত্র সম্বল।

অনেক পুঁথিগত বক্তৃতা বা ভাল ভাল কথা বলার চেয়ে কাজ আর অনুশীলনই যে ভাল অভ্যাস গ'ড়ে তোলার পক্ষে বেশী উপযোগী এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। যে গ্রন্থাগারের বই রাখার জায়গাগুলো পাঠকের কাছে পরিপূর্ণভাবে অবারিত সেই গ্রন্থাগার যে পাঠকদের মধ্যে নাগরিক-জনোচিত গুণ গ'ড়ে তুলতে সফলভাবে সাহায্য করতে পারে এ কথা স্বীকার করতেই হবে। সমস্ত নাগরিক গুণের মূল কথা হ'চ্ছে সমাজ ও প্রতিবেশীর সঙ্গে নিজের স্বার্থকে সুমসঞ্জস ক'রে তোলা—নিজের স্বার্থের জন্য বন্ধুর স্বার্থ বিপন্ন না করা। মুক্তদ্বার গ্রন্থাগার—যার কথা আমরা আলোচনা করছি, তা আমাদের নাগরিক গুণ গ'ড়ে তোলার ও পরীক্ষা করার একটা খুব ভাল প্রতিষ্ঠান। বই বের ক'রে নিয়ম মেনে ঠিক্ জায়গায় রাখা—বই পাড়্বার সময় যথাযথভাবে পাড়া, পাঠকক্ষে অপরের অসুবিধা না ক'রে পড়া, বইয়ে কোন জায়গায় দাগ দিয়ে অন্য পাঠকের বিচার-বুদ্ধিকে প্রভাবিত করা থেকে বিরত থাকা—এই সব সার্থক নাগরিক গ'ড়ে তুল্তে অনেক অংশে সাহায্য ক'রে থাকে। বস্তুতঃ নাগরিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সান্নিধ্যে এসেই মানুষ এই বিষয়ক গুণ অর্জন করে। আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ছাড়া আর কোন নিত্যব্যবহার্য সাধারণের প্রতিষ্ঠান নেই বললেও ভুল হবে না। তাই সব দিক্ থেকে বিচার করলে লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের নাগরিক গঠনের দায়িত্বও কম নেই, এ কথা স্বীকার করতেই হবে।

মহিলা গ্রন্থাগার

লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে গ্রন্থাগারকে গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে আমাদের গ্রন্থাগারে মহিলা পাঠকদেরও আকর্ষণ ক'রে আন্‌তে হবে ও যথোচিত সুযোগ দিতে হবে। আজকের দিনে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলেই যেমনভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাতে মহিলা গ্রন্থাগারের কথা উত্থাপন অনেকটা বহুপূর্ববর্তী ব্যবস্থা ব'লে মনে হ'তে পারে। বস্তুতঃ অগ্রসর দেশগুলোতে আজ নারী-পুরুষের জীবনযাপন-প্রণালী এবং অধিকার ও দায়িত্ব ক্রমশঃ এতই সদৃশ হ'য়ে উঠছে যে ওদেশে মহিলা গ্রন্থাগার আলাদা ক'রে করার প্রয়োজনই নেই। কিন্তু আমাদের দেশে এ অবস্থা এখনও আসে নি'। আসা বাঞ্ছনীয় কিনা জানিনা তবে শীগ্‌গির দু'চার দশ বছরের মধ্যে আস্‌বার খুব সম্ভাবনা আছে ব'লেও মনে হয় না।

বস্তুতঃ জীবনযাপন-প্রণালীর পার্থক্যের জন্য পুরুষ এবং মহিলার জন্য গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা একটু পৃথক্ হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ আমাদের দেশে পুরুষেরা যে সময়ে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার অবসর পায় মেয়েদের প্রায়শঃই সেই সময়ে অবসর থাকে না, আবার মেয়েদের যখন প্রচুর অবসর থাকে তখন পুরুষদের কর্মব্যস্ততার সময়। ফল কথা, পুরুষদের জন্য যে গ্রন্থাগার থাকে—সেই গ্রন্থাগার থেকে বই আনিয়ে অবসর সময়ে পড়া ব্যতীত আমাদের দেশের বর্তমান জীবনযাপন-প্রণালীতে প্রচলিত গ্রন্থাগার থেকে আর কোন উপকার মেয়েরা পেতে পারে না। কিন্তু এতক্ষণ আলোচনার দ্বারা এটা হয়ত প্রতিপন্ন করা গেছে আজকের যুগের গ্রন্থাগারে কেবলমাত্র বই ধার দেওয়া আর বই ফেরৎ নেওয়ার কাজ কর্‌লে চল্‌বে না। একে নাগরিক গঠনের কাজে সক্রিয়

ভূমিকা গ্রহণ কর্‌তে হবে। তাই সমাজের প্রায় অর্দ্ধাংশ নারীদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে একে আস্‌তেই হবে। পুরুষ সভ্যদের খেয়াল খুসীর মাত্র মাধ্যমে নারীজাতির সঙ্গে যেটুকু সংস্পর্শ স্থাপন করা যায় তা' দিয়ে অবসর বিনোদনের উপায় ক'রে দেওয়া যেতে পারে বা নীতিকথার দু'এক খানা বই পড়ানো যেতে পারে, কিন্তু মহিলা পাঠকদের ঠিক্ প্রয়োজন মত ক'রে গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা যেতে পারে না।

আমাদের দেশের সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা এখনও শিক্ষাপ্রাপ্ত মধ্যবিত্তদের অনুরূপ ক'রেই গঠিত আছে। প্রায় সমস্ত সমাজ এদের জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার চেষ্টা কর্‌ছে। সুতরাং এদের আচার-আচরণ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের সমস্ত শিক্ষা-ব্যবস্থাকে গ'ড়ে তুল্‌বার চেষ্টা না কর্‌লে আমাদের ব্যবস্থা খানিকটা অবাস্তব হবে ব'লেই আমার মনে হয়। সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে একথার বিরুদ্ধে তবু যুক্তি দেওয়া যায়, কিন্তু গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বর্তমান অবস্থায় অন্ততঃ একথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। কেননা, এখনও আমাদের দেশের যারা সাক্ষর তাদের প্রায় সকলেরই জীবনধারণ-পদ্ধতি একই রকমের। ফলে এদের বাড়ীর মহিলাদেরও অবসর, রুচি প্রভৃতি একই রকম হ'য়ে থাকে। গ্রন্থাগারের চোখ যতই ভবিষ্যতের দিকে থাক্ না কেন, বর্তমানের প্রাধান্য আর চাহিদা এ কখনই অস্বীকার করতে পারে না। তাই বয়স্ক-শিক্ষার সম্প্রসারণ ক'রে, নতুন পাঠক আকর্ষণ ক'রে গ্রন্থাগার নিজের উন্নতি কর্‌বার জন্য যতই চেষ্টিত থাক্ না কেন, উপস্থিত পাঠক-রূপ মূলধনের অপচয় এ কখনই কর্‌তে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো যদি সার্থক হ'য়ে উঠ্‌তে চায় তাহ'লে একে এর বর্ত্তমান পাঠক মধ্যবিত্তশ্রেণীস্থ লোকদের জীবন-যাত্রার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চল্‌তে হবে। ফল কথা, যেমন পুরুষদের জন্য সন্ধ্যাবেলায় বা অপরাহ্ণে গ্রন্থাগার খোলার ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে,

তেমনই মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগার খোলা রাখ্‌তে হবে দুপুর বেলায়—যখন মেয়েদের বিশ্রামের সময়।

আমাদের পল্লীর গ্রন্থাগারগুলোকে লোকশিক্ষার বাহন ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে এগুলোকে অনেকটা ক্লাবের মত ক'রে গ'ড়ে তোলা কার্যকরী হবে একথা আমরা স্থানান্তরে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছি—মেয়েদের গ্রন্থাগারের পক্ষে একথাটা আরও বেশী সত্য ব'লে আমার মনে হয়। বস্তুতঃ মেয়েদের স্বাভাবিক মেলামেশা করার ইচ্ছা পুরুষদের চেয়ে হয়ত বেশীই থাকে, অথচ আমাদের পর্দানসীন সমাজে, যেখানে মেয়েদের স্বাধীনতা সেদিন পর্যন্ত খুবই সঙ্কুচিত ছিল, সেখানে মেয়েদের মেলামেশার সুযোগ-সুবিধা খুবই কম থাকে। যে জন্যই হোক, আগে পল্লীগ্রামে মেয়েপুরুষ সকলেরই গ্রামের অন্যদের সঙ্গে যে সহজ আন্তরিক ভাবটা ছিল তা' অনেক ক'মে গেছে। ফলে আজ নতুন মেলামেশার কেন্দ্র গ'ড়ে তোলা দরকার হ'য়েছে। একথা ব'ল্‌লে বোধ হয় ভুল হবে না যে, এই রকম পরিবেশে গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র ক'রে যদি মেয়েদের সহজে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার একটা ক্ষেত্র গ'ড়ে তোলা যায় তা' হ'লে একসঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সুসম্পন্ন হ'য়ে উঠ্‌বে। অবশ্য একথা মনে রাখ্‌তে হবে। যে গ্রন্থাগারকে এ ভাবে গ'ড়ে তোলায় বিপদ্‌ও যে একেবারে নেই তা' নয়। গ্রন্থাগারের প্রধান উদ্দেশ্য পাঠককে বই পড়ানো—জ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত করা, স্বাবলম্বী ক'রে তোলা। এই মূল উদ্দেশ্য সাধন কর্‌বার জন্য পাঠকের দরকার। তাই পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য প্রয়োজন হ'লে গ্রন্থাগারে ক্লাবের মত একটা বিভাগ রাখাও অবাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু পাঠক যেখানে স্বতঃই গ্রন্থাগারে আস্‌তে আরম্ভ ক'রেছে সেখানে এই জাতীয় বিভাগ রাখার খুব সার্থকতা নেই। বরঞ্চ মানব-শরীরের এপেণ্ডিক্স যেমন পরিবর্ধিত হ'য়ে উঠ্‌লে শরীরের হানিকরই হ'য়ে পড়ে এবং চিকিৎসক নির্মমভাবে তাকে শরীরের মধ্য

থেকে উচ্ছিন্ন ক'রে দেন, তেমনই এই মিলন-কেন্দ্রগুলো যদি পরিবর্ধিত হ'য়ে গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী হয় তবে নিশ্চয়ই এগুলোকে বন্ধ ক'রে দিতে হবে। গ্রন্থাগার-পরিচালনার ক্ষেত্রে মিলন-কেন্দ্র বা ক্লাবের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আমাদের এই সতর্কতা-টুকু ভুল্‌লে চল্‌বে না।

মহিলাদের অবসর সময়ে তাদের জন্য গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা রাখ্‌তে হবে এবং যতদূর সম্ভব এটাকে মেয়েদের সার্থক মিলন-কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। এটা হ'ল মহিলাদের গ্রন্থাগারে আকর্ষণ করার প্রাথমিক ব্যবস্থা। কিন্তু এ ব্যবস্থা সব মহিলা প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই প্রয়োজন। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এ ছাড়াও আরও নানাবিধ ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। মহিলাদের জীবন-যাপনের কতকগুলো বিশেষ সমস্যা আছে। গ্রন্থাগার যদি এই সব সমস্যার সমাধানে সাহায্য করতে পারে তবেই গ্রন্থাগার মহিলাদের প্রকৃত সেবা করতে পার্‌বে। আমাদের বাংলা দেশের মধ্যবিত্ত সমাজে মহিলারা দিবারাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রেও আর্থিক ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে পুরুষদের মুখাপেক্ষী। শুধু তাই নয়। যতদূর সম্ভব কৃচ্ছ্রসাধন ক'রেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের পরিবারের ব্যয় সঙ্কুলান ক'রে উঠ্‌তে পারেন না। এই অবস্থার প্রতিকার করা একান্ত প্রয়োজন। বস্তুতঃ, সংসার-যাত্রা-নির্বাহ ব্যাপারটি পুরোপুরি মেয়েদের আয়ত্তাধীন ব্যাপার। পুরুষেরা যতই আয় করুন না কেন মেয়েরা ঠিক্ মত সংসার চালাতে না পার্‌লে কোন সংসারেই সাধারণ স্বাচ্ছন্দ্য পর্যন্ত হওয়া সম্ভব নয়। অপচয়-নিবারণ, যথাযথ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, আয়-ব্যয়ের সাম্যবিধান, সুলভ স্বাস্থ্যকর বিচিত্র খাদ্যের ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবনে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি, এ সবের উপরই সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করে। এই সব ভাল ক'রে পারার উপরই গৃহিণীপণার সফলতা নির্ভর করে। এ সব বিষয়ের শিক্ষা অনেকখানি মেয়েরা হাতে কলমে বাপ-

যার কাছে থেকে পায় একথা ঠিক্। তবুও দ্রুত-পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হ'লে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারকে কাজে লাগাতে হ'লে মাত্র সেই শিক্ষার উপর নির্ভর করা চলে না। সুতরাং গৃহস্থালীতে সাফল্য লাভ কর্‌বার জন্য মেয়েদের আজ জ্ঞান আহরণ করা দরকার।

মেয়েদের পক্ষেও অবসর সময়ে আয় করার সুযোগ কম নেই। তা ছাড়াও আমাদের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করা হবে ব'লে আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং নানাবিধ নতুন শিল্পের খবর এখন জানা যাবে। সেগুলো শেখার জন্য তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক নানারকম বইও পাওয়া যাবে। সুতরাং জীবিকা-সমস্যার সমাধানেও গ্রন্থাগার মেয়েদের সক্রিয় সাহায্য ক'র্‌তে পার্‌বে এ আশা করা খুব অসঙ্গত নয়।

আমাদের জাতির ধর্ম ও কৃষ্টি নিয়ে আমরা খুবই গর্ব করে থাকি। কোন দুই একজন লোক ধর্ম সম্বন্ধে ভাল কথা প্রচার কর্‌লেই একটা জাতির ধর্ম সম্বন্ধে এতটা গৌরব হ'তে পারে না। বস্তুতঃ আমাদের মেয়েরা কঠোর আত্মসংযমের মধ্য দিয়ে ধর্মের সমস্ত অনুশাসন পালন ক'রেই আমাদের ধর্ম ও কৃষ্টিকে গ'ড়ে তুলেছেন। তাই গৃহস্থালীর জ্ঞান-অর্জনের, জীবিকা-সমস্যা সমাধানের উপায় জানার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় সাহিত্য পড়ায়ও মেয়েদের আগ্রহ দেখা যায়। গ্রন্থাগার সে আগ্রহও মেটাতে পারে।

সন্তান-পালনে ও সন্তানের শিক্ষায় পিতা মাতা উভয়েরই দায়িত্ব আছে বটে তবুও সন্তান পালনে মায়ের দায়িত্ব অনেক বেশী। আজ কাল স্ত্রীশিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের শিক্ষা বিষয়েও মেয়েরা বেশী দায়িত্ব গ্রহণ কর্‌তে পার্‌ছে সুতরাং এই দুই বিষয়েও মেয়েদের জান্‌বার আগ্রহ বেশী হওয়া খুব স্বাভাবিক।

তার পরে মেয়েদের উৎকর্ষ দেখাবার কতকগুলো বিশেষ ক্ষেত্র আছে। এইগুলোকে চৌষট্টি কলা ব'লে প্রাচীন কালে বলা হ'ত। এর মধ্যে রান্না-বান্না থেকে আরম্ভ ক'রে, মালা-গাঁথা, রূপ-সজ্জা করা, পান সাজা, আলাপ ব্যবহার করা, মনোরঞ্জন করা, নাচ গান সবই ছিল। বস্তুতঃ ভারতের গৌরবময় যুগে সংস্কৃতি যা' গড়ে উঠেছিল তার অনেক খানির জন্যই মেয়েদের এই চতুঃষষ্টি কলা-চর্চা যে কৃতিত্বের দাবী করতে পারে, একথা অনস্বীকার্য। মুসলমান আমলে কঠোর পর্দা প্রথার প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই চর্চা অনেকাংশে লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু এত বিস্তৃতভাবে না হ'লেও পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সব বিষয়ের অনেকগুলির বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চর্চা আজও হচ্ছে। বলা বাহুল্য সব দেশে সব যুগে মেয়েদের এই সব বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য একটা স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে। তাই আমাদের দেশে ঐ চতুঃষষ্টিকলার সম্পূর্ণ পুনরভ্যুদয় না হ'লেও এ বিষয়ে যতটা যা' জানা যায় তার জন্য মেয়েদের স্বাভাবিক আগ্রহ ও কৌতূহল কম থাকে না। গ্রন্থাগার এ বিষয়ে নিশ্চয়ই অনেক সাহায্য করতে পারে।

মেয়েদের বিশেষভাবে আকর্ষণ করে এই রকম গোটাকয়েক বিষয়ের উল্লেখ করা হ'ল। এ ছাড়াও পুরুষেরা যে সব বিষয় জানতে আগ্রহশীল হন, তার মধ্যে বিশেষ বিশেষ কারিগরী শিক্ষা, কিংবা বিশেষ বিশেষ খেয়াল মেটানোর বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে মেয়েদেরও সমান আগ্রহ থাকা খুবই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ আমাদের দেশে বিশেষ ক'রে মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগার আজও গ'ড়ে ওঠে নি', তবুও ত' মেয়েরা গ্রন্থাগারের পাঠিকা হ'য়ে থাকেন। তাঁরা যে বই পড়েন তা' পুরুষ-মেয়ে-নির্বিশেষে সকলেরই অবসর বিনোদনের বই, বা সকলেরই সমানভাবে জ্ঞেয় বিষয় সম্বন্ধে লিখিত বই। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থাগারের অনেক বইও মেয়েদের গ্রন্থাগারেও অপরিত্যাজ্য।

উপরের এই সামান্য আলোচনা থেকে দেখান হ'ল যে মেয়েদের জন্য গ্রন্থাগার খোলা থাকা দরকার—সাধারণতঃ পুরুষদের জন্য যখন এটা খোলা থাকে তখন ছাড়া অন্য সময়ে। মেয়েদের জন্য বইও দরকার এমন কতকগুলো বিশেষ জাতের যা সম্ভবতঃ পুরুষ পাঠকদের বিশেষ কোন কাজে লাগ্‌বে না। তারপর মেয়েদের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ক'রে দিতে গেলেও পুরুষদের সাহচর্য, হয়ত, অসুবিধা সৃষ্টি কর্‌তে পারে। এবং সর্বশেষে মেয়েদের গ্রন্থাগার পরিচালনার কাজ ভাল ভাবে কর্‌তে গেলে পুরুষদের প্রয়োজনের থেকে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন। মোটের উপর এই চার্‌টে কথা বিবেচনা কর্‌লে আমাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগ্‌বে সাধারণ গ্রন্থাগারের দ্বারাই মহিলাদের সেবা চল্‌তে পার্‌বে, না, তাঁদের জন্য একটা পৃথক্ গ্রন্থাগার তৈরী করা দরকার।

এই প্রশ্নের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসার আগে আমাদের আরও দুই একটা কথা ভাবা দরকার। মেয়েদের মধ্যে এখনও শিক্ষার তেমন বিস্তার হয় নি'। মধ্যবিত্ত সমাজেও এমন মেয়ের সংখ্যা খুব নগণ্য নয় যাঁরা নিজেরা স্বাধীনভাবে লিখ্‌তে বা পড়্‌তে পারেন না। লোক-শিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারকে যদি আমরা সকলের মেলামেশার জায়গা ক'রে গ'ড়ে তুল্‌তে পারি তা' হ'লে এই সব পশ্চাৎপদ মেয়েরাও মেলা-মেশার সুবিধার জন্য এখানে আস্‌বে। আর মেয়েদের মধ্যে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার যোগ্যতা আশ্চর্য রকম বেশী থাকার জন্য এই সব মেয়েরাও সকলের সঙ্গে সমান তালে মেশার তাগিদে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নিজেদের শিক্ষার মানেরও উন্নতি সাধন কর্‌বে। খুবই আশা করা যায় এই সব গ্রন্থাগারে যদি প্রাণ খুলে মেশার মত কর্মী থাকে তবে অশিক্ষিত মেয়েদেরও এখানে টেনে আনা খুব কঠিন হবে না। ফলে নিরক্ষরতা-দূরীকরণের কাজ এই রকম গ্রন্থাগারের মাধ্যমে যত দ্রুত সম্পন্ন হ'তে পার্‌বে তেমন আর কোন উপায়ে সম্ভব হবে না।

এখন এই সব অনগ্রসর মেয়েদের কথা যদি মনে রাখা যায় তা' হ'লে পুরুষদের সান্নিধ্য যে এই রকম গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ ক'রে দেবে একথা প্রতিপন্ন কর্‌তে খুব যুক্তিজালের অবতারণা করার প্রয়োজন হয় না। একথা স্পষ্ট বোঝা যায় যে এই সব গ্রন্থাগার পরিচালনা মেয়েদের দিয়ে ছাড়া হ'তে পারে না। বস্তুতঃ মেয়েরা, বিশেষ ক'রে অশিক্ষিত মেয়েরা, কখনও অনাত্মীয় পুরুষদের কাছে নিঃসঙ্কোচে নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌তে পার্‌বেন না।

সুতরাং বোঝা যাচ্ছে মেয়েদের গ্রন্থাগারকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে হ'লে গ্রন্থাগারের পৃথক্ কার্যকাল চাই, পৃথক পুস্তক-সংগ্রহ চাই এবং পৃথক পরিচালিকা ও কর্মিদল চাই। এই পরিপ্রেক্ষিতে মহিলাদের জন্য পৃথক্ গ্রন্থাগার হওয়া দরকার কিনা আমাদের আলোচনা ক'রে দেখা দরকার।

মহিলাদের জন্য পৃথক্ গ্রন্থাগার তৈরী ক'র্‌তে হ'লে পৃথক্ বাড়ীর দরকার হবে—সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রাপ্তব্য বহু বইকে অযথা আর একবার ক'রে কিন্‌তে হ'বে, এবং উপযুক্ত কর্মীর যেখানে একান্ত অভাব সেখানে নতুন একদল কর্মী জোগাড় কর্‌তে হবে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার। অবশ্য কর্মী-সম্বন্ধে হয়ত' এই কথা বলা হবে যে, পূর্বেই প্রতিপন্ন করা হয়েছে পুরুষ কর্মী দিয়ে সার্থক লোকশিক্ষার বাহন মহিলা গ্রন্থাগার চালান যাবে না। কিন্তু মহিলাদের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে এসে কাজ করা ছাড়াও গ্রন্থাগারের করার আরও বহু কাজ আছে। সব কাজের জন্যই নতুন ক'রে কর্মিদল জোগাড় করা সোজা কথা নয়। বিশেষ ক'রে যদি সব কর্মীরই মহিলা হ'তে হয় তবে লোক পাওয়ার অসুবিধা আরও অনেক বেড়ে যাবে। তাই সমস্ত গ্রন্থাগার যদি একসঙ্গে পরিচালনা করা হয়—আর গ্রন্থাগারের অধীনে যদি একটা মহিলা বিভাগ গঠন ক'রে সেই বিভাগকে উপযুক্ত সময়ে, খোলার

বন্দোবস্ত ক'রে উপযুক্ত কর্মীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাতে বাড়ী আস্‌বার কর্মী সব কিছুরই অনেকটা ব্যয় সঙ্কোচ করা যাবে এবং কাজেরও খুব ক্ষতি হবে না ব'লে আমার বিশ্বাস। তা' ছাড়া আমাদের দেশে মেয়েদের জন্য যত রকমের বইয়ের চাহিদা আছে ব'লেই দেখানো যাক্ না কেন, একথা ত' অস্বীকার করা চলে না যে ঐ সব বিষয়ে বাংলা-ভাষায়-লেখা বইয়ের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সেইগুলো মাত্র নিয়ে গ্রন্থাগারের আকারের কোন সংগ্রহই রচনা করা চলে না। তাই মহিলা গ্রন্থাগারকেও বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ বইই এমন রাখ্‌তে হবে যা পুরুষ-মহিলা-নির্বিশেষে সাধারণের পাঠযোগ্য। সুতরাং ব্যয়-সঙ্কোচের কথা বিবেচনা ক'রে ও বাস্তব উপযোগিতার কথা মনে রেখে পৃথক্ মহিলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার চেয়ে সাধারণ গ্রন্থাগারে মহিলা বিভাগ স্থাপনই অধিকতর সমর্থনযোগ্য মনে হবে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের আরও একটা কথা মনে রাখ্‌তে হবে। গ্রন্থাগার-সম্প্রসারণ কাজের একটা প্রধান লক্ষ্য হ'চ্ছে শিশুদের গ্রন্থাগার-মনা ক'রে তোলা। ছোট অবস্থার থেকেই যাতে শিশুরা গ্রন্থাগারে আস্‌তে অভ্যস্ত হ'তে পারে, এই জন্য মায়েদের দিদিদের সঙ্গেই শিশুদের গ্রন্থাগারে আস্‌বার প্রেরণা পাওয়া উচিত। অর্থাৎ মহিলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে সংলগ্ন থাক্‌লে, শিশু গ্রন্থাগারও ভাল চল্‌বার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং মহিলা গ্রন্থাগারকে সর্বথা পৃথক্ না ক'রে তাকে সাধারণ গ্রন্থাগারের অঙ্গ হিসাবেই গ'ড়ে তোলা উচিত।

বয়স্ক-শিক্ষার ক্ষেত্রে যে যে যুক্তির বলে আমরা গ্রন্থাগারকে ক্লাবের মত ক'রে গ'ড়ে তোল্‌বার কথা বলেছি সেই সব যুক্তি মহিলা গ্রন্থাগারের পক্ষেও প্রযোজ্য। সুতরাং মহিলা-গ্রন্থাগার-পরিচালনার ক্ষেত্রেও একই রকম সতর্কতা ও ব্যবস্থা অবলম্বনীয়।

শিশু গ্রন্থাগার

লোকশিক্ষায় সমুন্নতির আদর্শকে পরিপূর্ণভাবে সার্থক ক'রে তুলতে হ'লে আমাদের মনোযোগ যে সমস্ত বিষয়ে নিবদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন শিশু-গ্রন্থাগার তা'র মধ্যে একটা। যে কোনও দেশের জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি নির্ভর করে সেই দেশের অধ্যয়ন-নিরত ব্যক্তিবৃন্দের উপর। অথচ অধ্যয়নের অভ্যাস বিনা চেষ্টায় বা বিনা শিক্ষায় কখনও জন্মাতে পারে না। তাই সদালাপ, সামাজিক ব্যবহার প্রভৃতির মত গ্রন্থপাঠের অভ্যাসও শৈশব হ'তেই আয়ত্ত করতে হয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশের অনেক মেধাবী ছাত্রও আপন চেষ্টায় স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থপাঠের অভ্যাস আয়ত্ত না ক'রে, কেবলমাত্র গুরুমুখলব্ধ জ্ঞানের উপর বা নোট বইয়ের উপর নির্ভর ক'রে থাকে ব'লেই আমাদের দেশে শিক্ষার যথোচিত উন্নতি হ'চ্ছে না। তাই শিশুকাল হ'তেই যাতে স্বতন্ত্র-ভাবে নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জনের শিক্ষালাভ হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। বলা বাহুল্য স্বাধীনভাবে জ্ঞানার্জনের সব চেয়ে বড় সহায় গ্রন্থাগার।

কিন্তু গ্রন্থাগারে এই স্বাধীন পাঠের যে সুযোগ তা' কি শিশু যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পারে? শিশু-গ্রন্থাগার-সংগঠকদের প্রথম চিন্তনীয় বিষয় হচ্ছে শিশুদের যোগ্যতার সঙ্গে গ্রন্থাগারের এই স্বাধীন-পাঠ-ব্যবস্থার সমন্বয়ের উপায়। শিশুদের যতই তীব্র কৌতূহল থাকুক্ না কেন, শিশুদের জিজ্ঞাসা যতই বিচিত্র হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে শিশুরা কারও বিনা সাহায্যে সঠিকভাবে আপনাদের পাঠ্য নির্বাচন ক'রে সার্থকভাবে তা' ব্যবহার করতে পারে না। দাঁত উঠ্‌লে শিশু সব রকম খাদ্যই খেতে পারে ব'লে কোন বাপ-মা'ই শিশুকে আপন খাদ্য নির্বাচন করতে দেন না। শিশুর

শারীরিক পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্য নির্বাচন করা একান্ত আবশ্যক ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। ঠিক্ তেমনই শিশুদের মানসিক গঠন বিচার বিবেচনা ক'রে তাদের পাঠ্য নির্বাচন করতে হয়। সুতরাং গ্রন্থাগারের প্রধান যে বৈশিষ্ট্য—পাঠ্য বস্তু নির্বাচনের অবাধ স্বাধীনতা—তাকে শিশুদের ক্ষেত্রে অনেকখানিই সঙ্কুচিত করতে হয়। কিন্তু খেলার ছলে শিশুরা যে আগ্রহ নিয়ে পাঠ করতে পারে, অবাধ স্বাধীনতার মধ্যে তারা যেমনভাবে আপনাদের সমস্ত সত্তাকে নিয়োজিত করতে পারে, আপন-নির্দিষ্ট কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন ক'রে তারা যে আত্মনির্ভরতা লাভ করতে পারে—সঙ্কুচিত অধিকারের মধ্যে তা' কখনই সম্ভব হয় না। সুতরাং একদিকে যেমন পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে শিশুকে গ্রন্থাগারের মধ্যে ছেড়ে দিলে তার পক্ষে ঠিক্ বই বেছে নেওয়া কঠিন হয়—সে কখনও গল্প-রূপকথার মোহ কাটিয়ে উঠ্তে পারে না, তেমনই অন্যদিকে পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আত্মনির্ভরতা বা গ্রন্থ-প্রীতি গ'ড়ে উঠ্তে পারে না। তাই শিশু-গ্রন্থাগারের প্রথম প্রশ্ন স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন।

সার্থক পরিচালনার দ্বারাই এই জটিল সমস্যার সমাধান হ'তে পারে। যথোচিত পরিচালনায়, শিশুকে বিনা পথনির্দেশে গ্রন্থাগারে ছেড়ে দেবার অসুবিধা যেমন থাকে না তেমনই গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষকের অভি-প্রায়ানুযায়ী গ্রন্থ পাঠ ক'রেও শিশু আপনার স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হ'চ্ছে ব'লে বুঝ্তে পারে না। কিন্তু এই সার্থক পরিচালনার কাজ খুব সহজ নয়। শিশুদের যাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসতে পারেন না, শিশু-মনের বৈশিষ্ট্যকে যাঁরা সহানুভূতির সঙ্গে দেখ্তে পারেন না, তাঁদের পক্ষে এই পরিচালনা-কার্যে সাফল্যলাভ ক'র্বার কোনই সম্ভাবনা নেই।

মনে রাখ্তে হবে শিশুরা সাধারণতঃ কর্মচাঞ্চল্য ভালবাসে। প্রাপ্তবয়স্ক গ্রন্থকীটদের মত তারা একস্থানে নিশ্চল হ'য়ে বসে দীর্ঘকাল

অধ্যয়নরত থাকতে পারে না। কোন ভাব যখন তাদের মনে আসে তখন তারই নানা দিক্ নিয়ে গভীর চিন্তা তারা করে না—বরঞ্চ এইভাবের সঙ্গে জড়ানো নানা ভাব এসে তাদের চিন্তাধারাকে বিক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। তা' ছাড়া চিন্তার চেয়ে কাজের দিকেই শিশুদের সহজ প্রবণতা থাকে। সেইজন্য খুব কম ক্ষেত্রেই প্রকৃত পাঠ শিশুর সহজাতভাবে প্রিয় হয়।

এই কর্মানুরাগ এবং চাঞ্চল্য যেমন শিশুদের পাঠাভ্যাসের পরিপন্থী তেমনই শিশুর আরও কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে। এগুলির সাহায্যে আমরা শিশুমনের এই বিক্ষেপ ও চাঞ্চল্যকে বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি।

প্রথমতঃ শিশুমনের কৌতূহল অফুরন্ত। প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি আপনার জ্ঞাতব্য বিষয়কে আপনার প্রয়োজনের মধ্যে সীমায়িত রাখে। যে বিষয়ে সে প্রয়োজন বোধ করে না, সে বিষয়ের অনেক চমকপ্রদ সংবাদ সম্বন্ধেও তা'র কোনও আগ্রহ থাকে না। শিশুর প্রয়োজন ব'লে বিশেষ কিছু নেই। পৃথিবীর অকিঞ্চিৎকরতম পদার্থও তার পরম সম্পদ্। বস্তুতঃ কোথাও কোন কিছু নতুন ঘটনা ঘট্‌লেই শিশু তা' জানতে কৌতূহলী হ'য়ে ওঠে। শুধু তাই নয়—বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মটিকে নিঃশেষে বুঝে নেবার ইচ্ছায় সে অনবরতই তার পিতামাতা, শিক্ষক প্রভৃতিকে কী, কেন প্রশ্ন ক'রে থাকে। প্রয়োজনবোধের বেড়া শিশুমনের অনন্ত জিজ্ঞাসা-ক্ষেত্রকে সঙ্কীর্ণ ক'রে তোলে না। বস্তুতঃ এই কৌতূহলকে জাগ্রত রাখ্‌তে ও উদ্দীপিত করতে পারলে শিশুকে জ্ঞানের দিকে অনেকখানি অগ্রসর ক'রে দেওয়া যায়।

শিশুর দ্বিতীয় প্রবৃত্তি সংগ্রহপ্রিয়তা। আমার এত জিনিষ আছে এই অধিকারবোধে আপন প্রাধান্য উপলব্ধি করতে শিশু বড় ভালবাসে। তাই উপলখণ্ড থেকে তৃণখণ্ড পর্যন্ত সমস্ত কিছুকেই শিশু অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সংগ্রহ ক'রে থাকে। এই সংগ্রহপ্রিয়তা প্রত্যক্ষভাবে

জ্ঞানার্জনের সহায়ক না হ'লেও সুপরিচালিত হ'লে এই প্রবৃত্তিও জ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম্পরাভাবে সাহায্য ক'রে থাকে।

শিশুর পড়ার পক্ষে সবচেয়ে উপকারক প্রবৃত্তি হ'চ্ছে কল্পনা-প্রবণতা ও গল্পপ্রিয়তা। এই গদ্যময় বাস্তব জগতের বহু পদার্থ আপন রূপ হারিয়ে শিশুর মনোজগতে পদ্যময় হ'য়ে ওঠে। "ঘটে যাহা সব সত্য নহে—সেই সত্য যা' রচিবে তুমি," এই কথা ব্রহ্মা বাল্মীকিকে ব'লেছিলেন কিনা জানিনা, কিন্তু এ কথা বিধাতাপুরুষ যে তাঁর শিশু বন্ধুদের ব'লে দিয়েছিলেন, তা' নিঃসন্দেহে সত্য। তাই বস্তু-জগতের নিয়মের বিরুদ্ধে শিশু সহজেই বিশ্বাস কর্‌তে পারে বার-হাত কাঁকুড়ের তের-হাত বিচির কথা, বিশ্বাস কর্‌তে পারে জীবন-কাঠি মরণ-কাঠির অপ্রাকৃত তত্ত্ব, যাত্রা কর্‌তে পারে মায়া-নৌকায় চ'ড়ে হীরাফলে ভর্তি সোনার গাছের সন্ধানে। প্রত্যক্ষ জগৎ হ'তে বহু দূরে—যা' অজ্ঞাত, যার সত্তা প্রকৃতির কঠোর নিয়মের বাঁধনে নিরূপিত হ'য়ে নেই, প্রত্যক্ষ অনবরত যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন ক'রে তা'র রহস্যকে নিঃশেষিত ক'রে দিতে পারে নি', সেই অনাবিষ্কৃত দূর রাজ্যে বিচরণ ক'রে থাকে শিশুমন। তাই নিকটে তার আকর্ষণ নেই—আকর্ষণ তার দূরে। সাত সমুদ্র তের নদীর পারে পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চ'ড়ে চ'লে যেতে সে সর্বদাই প্রস্তুত। যেন সেই তার দেশ। সেইখানকার রাজ্যের মানুষদের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হ'তে তার কোনরূপ অসুবিধাই হয় না। রূপকথা সেইজন্য শিশুদের এত প্রিয়। অভিনয়ের অবাস্তবতা এই জন্যই তা'দের এত আনন্দ দিতে পারে। বস্তুতঃ শিশুমনের এই গল্পপ্রিয়তা ও কল্পনা-প্রবণতা শিশুদের পরিচালনা ব্যাপারে অনেকখানি সাহায্য ক'রে থাকে।

শিশুদের আর একটি মাত্র প্রবৃত্তির উল্লেখ ক'রেই এ প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাবে। সমস্ত শিশুরই অধিনায়কত্ব কর্‌বার একটা

স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। প্রতিযোগিতায় আর সকলকে পরাভূত ক'রে আপন শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন কর্‌ব এবং সকলকে আমার আজ্ঞানুবর্তী কর্‌ব এই প্রবৃত্তি শিশুদের সহজাত। এই প্রবৃত্তিকে সার্থক প্রতি-যোগিতার ক্ষেত্রে কার্যকরী ক'রে তুল্‌তে পার্‌লে শিশু আপন ইচ্ছায়ই অনেকক্ষণ পর্যন্ত একই কাজ ক'রে যেতে ক্লেশ বোধ করে না।

বস্তুতঃ শিশু অপছন্দ করে কাজ—শিশু চায় খেলা। যা' কাজ নয়, খেলা মাত্র—তাতে শিশুর ক্লান্তি নেই। কিন্তু খেলাও ত' কাজ। খেলার নিয়ম পালন ক'রে খেল্‌লেই খেলা পরিপূর্ণ আনন্দ দান কর্‌তে পারে। বস্তুতঃ খেলা আর কাজের পার্থক্য আপন ইচ্ছায় সাধিত হওয়া আর পরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার মধ্যে—কার্যের সঙ্গে-সঙ্গেই আনন্দপ্রাপ্তি আর কার্য-সম্পাদনের বহুক্ষণ পরে ফল-প্রাপ্তির মধ্যে। যদি অপরের দ্বারা নিয়ন্ত্রণের তথ্যটিকে অজ্ঞাত রাখা যায়, যদি কার্যের সঙ্গে সঙ্গেই আনন্দ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যায়, তা' হ'লে কাজই খেলা হ'য়ে ওঠে। তার অনুষ্ঠানে শিশু অনুরাগই বোধ ক'রে থাকে—বিরাগ বোধ করে না।

বস্তুতঃ শিক্ষক এবং গ্রন্থাগারিক, পিতা-মাতা এবং পরিচালক সকলকেই লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে, কেমন ক'রে শিশুর স্বাভাবিক কল্পনা-প্রবণতা, গল্প-প্রিয়তা, সংগ্রহ-প্রিয়তা, কৌতূহল ও অধিনায়কত্বের স্পৃহাকে প্রয়োগ ক'রে তার স্বাভাবিক মানসিক চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপকে জয় করা যায়। শিশু-গ্রন্থাগারের গঠন-প্রকৃতির দিকে আমাদের নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখ্‌তে হ'বে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই মূল প্রশ্নটা আমরা বুঝ্‌তে না পার্‌ছি ততক্ষণ শিশুদের পড়াবার জন্য আমাদের যত্ন ও চেষ্টা পণ্ডশ্রম প্রতিপন্ন হ'তে বাধ্য।

আমরা পূর্বে যা' ব'লেছি তাতেই প্রতিপন্ন হয়েছে শিশু-গ্রন্থাগারে যেমন গ্রন্থের ব্যবস্থা থাক্‌বে, যেমন তাদের সুবিধাজনক

অন্যান্য আয়োজন থাক্‌বে, তেমনই গ্রন্থপাঠে শিশুদের যাতে আগ্রহ জন্মায় তারও বিস্তৃত ব্যবস্থা কর্‌তে হবে। শিশুদের গল্প বল্‌তে হবে, তাদের গান শুন্‌তে দিতে হবে, তাদের প্রশ্ন কর্‌তে দিতে হবে। শিশুদেরও গল্প বল্‌তে উৎসাহিত কর্‌তে হবে, তাদের অভিনয়-আবৃত্তি-আলোচনার সুযোগ রাখ্‌তে হবে। তাদের আপনাপন কৃতিত্বের কাহিনী বর্ণনায় উৎসাহিত কর্‌তে হবে। এক কথায় শিশু-গ্রন্থাগার হবে শিশুদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে শিশুরা পাবে আনন্দের পরিপূর্ণ আয়োজন, আপনাকে বিকাশ এবং প্রকাশ কর্‌বার বিচিত্র সুযোগ ও ব্যবস্থা।

প্রশ্ন হ'তে পারে, গল্প, সঙ্গীত অভিনয়ের সঙ্গে গ্রন্থাগারের সম্পর্ক কী। ঐ সমস্ত দিয়ে শিশুকে পুরান জ্ঞানভাণ্ডারের যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন উদরস্থ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে বটে, কিন্তু তাকে জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা গেল কী ভাবে? বাস্তবিকই অভিনয়াদির আয়োজনকে যদি ঠিক্ ঠিক্ পরিচালিত করা না যায়, তবে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার বিফল হওয়ার পরিপূর্ণ আশঙ্কা থাকে। ঐ সমস্ত আয়োজন আবশ্যক, কিন্তু মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হ'লে ঐ আয়োজন গ্রন্থাগারের সহায়ক না হ'য়ে বিপর্যয়ের কারণ হ'য়ে থাকে। গ্রন্থাগারিককে মনে রাখ্‌তে হবে, আমাদের মূল উদ্দেশ্য শিশুকে গ্রন্থের দিকে পরিচালিত করা, সে যাতে আপনিই বই পড়ে তার পরিবেশ প্রস্তুত করা। একটা সুন্দর গল্পের অর্ধেক খুব ভাল ক'রে ব'লে যদি বলা হয় অবশিষ্ট অর্ধেক অমুক বইতে পাওয়া যাবে—আর সেই বই যদি শিশুর উপযুক্ত হয়—তবে শিশু ঐ বই থেকে যে ঐ গল্পটুকুই শুধু পড়্‌বে তা' নয়, সে ঐ বইয়ের অন্যান্য গল্পও পড়্‌বে ব'লে মনে হয়। সুন্দর-সুরে-গাওয়া গানটি কোথায় আছে জান্‌তে পার্‌লে, শিশুর পক্ষে ঐ গান আয়ত্ত করার পরিপূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। অভিনয়-ব্যবস্থা শিশুকে সাক্ষাৎ-

ভাবেই গ্রন্থপাঠে সাহায্য ক'রে থাকে। কোন শিশু সুযোগ পেলে নিশ্চয়ই আপন কাজের ব্যাখ্যা করবে। সে বলবে তার পাখীকে সে কি সুন্দর পড়াতে শিখিয়েছে, সে নিজের কুকুর বা খরগোসকে কি সুন্দর শিক্ষা দিয়েছে, মাছ-ধরা খেলা-ধূলায় সে কিরূপ নৈপুণ্য অর্জন করেছে। তার বর্ণনার সমাপ্তি হ'লে গ্রন্থাগারিক যদি অন্যান্য বালককে বলেন যে অমুক গ্রন্থে এই সমস্ত বিষয়ে উৎকর্ষ লাভের পন্থা বর্ণিত আছে তবে খুব সম্ভবতঃ অনুকরণ-প্রিয় শিশুগণ ঐ সব গ্রন্থ পড়বে। মোট কথা, উপযুক্ত গ্রন্থাগারিকের পক্ষে শিশুদের গ্রন্থপাঠের দিকে পরিচালিত করা খুব কঠিন নয়—আর এইভাবে পরিচালিত করতে পারলে শিশুরা নিজের চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করতে শিখবে। বহুবিষয়ক পাঠ্যের মধ্য থেকে ইচ্ছামত পাঠ্য নির্বাচনের অবসর থাকায় শিশুদের স্বাধীন চেষ্টার এখানে অভাব হয় না। তা'ছাড়া আনন্দের পরিবেশের মধ্যে বহু বিষয়ক পাঠ্যের সংবাদ পরিবেশিত হয় ব'লে এই পাঠও খেলার অঙ্গ ব'লেই বিবেচিত হ'য়ে থাকে। অথচ এই ব্যবস্থায় শিশুকে নিঃসহায়-ভাবে পুস্তক-অরণ্যের মধ্যে ছেড়ে দেবার ঝুঁকিও নিতে হয় না।

শিশু-গ্রন্থাগারের মূল-সমস্যাটি মীমাংসিত হবার পর এর পরিচালনা সম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন আলোচনা করা প্রয়োজন। সর্বপ্রথম আলোচ্য—শিশু-গ্রন্থাগারের অবস্থিতি কিরূপ হওয়া উচিত। শিশুদের জন্য কি পৃথক্ গ্রন্থাগার গঠন করা উচিত, না সাধারণ গ্রন্থাগারের বিভাগরূপেই শিশু-গ্রন্থাগার পরিচালিত হওয়া উচিত?

শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারলে যে অনেক বিষয়ে সুবিধা হ'তে পারে—একথা নিঃসন্দেহে সত্য। এই ব্যবস্থায় বয়স্ক পাঠকদিগের অধ্যয়নে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটবার সম্ভাবনা থাকে না, উপযুক্ত শিশু-গ্রন্থাগারিক তাঁর পরিপূর্ণ চিন্তা ও যত্ন শিশুদের জন্য ব্যয় করতে পারেন—এই দুটি সুবিধা স্বতন্ত্র শিশু-গ্রন্থাগারের অনুকূলে

প্রবল যুক্তি সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হ'বে শিশুদের খাদ্য ব'লে পৃথক্ নির্দিষ্ট খাদ্য খেয়ে শিশু যেমন পরিপূর্ণভাবে বাড়্‌তে পারে না, তেমনই মাত্র শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রন্থাগারের দ্বারা শিশুর যথোপযুক্ত উপকার সাধন করা যায় না। গ্রন্থাগারের সমস্ত ব্যবস্থাই হয় এক কাল্পনিক সাধারণ পরিবেশ্যের জন্য। কিন্তু ঐরূপ পরিবেশ্যের প্রকৃত অস্তিত্ব কোথায়ও থাকে না। কেউ বা তথাকথিত সাধারণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ:হন, কেউ বা কিঞ্চিৎ ন্যূন হন। ব্যবস্থা সাধারণের জন্য— অথচ যেখানে ব্যক্তির বিকাশ প্রধান লক্ষ্য সেখানে বিশেষকে কোন ক্রমেই অবহেলা করা যায় না। এই বিশেষের জন্য ব্যবস্থা কর্‌তে গেলে শিশু-গ্রন্থাগারকে আর মাত্র শিশুজনোচিত ক'রে রাখা চলে না। বাস্তবিক কোন কোন শিশু যথোচিত বয়ঃপ্রাপ্তির পূর্বেই এরূপ জ্ঞানার্জন-স্পৃহা ও ক্ষমতা অর্জন করে যে তাদের বয়স্কদের সমান মনে না কর্‌লে তাদের প্রতি অবিচার করা হয়। পাঠে অসাধারণ অগ্রগামী বালককেও সাধারণের স্বার্থে বিদ্যালয়ে অনেকখানি পশ্চাৎপদ থাক্‌তে হয়, কিন্তু গ্রন্থাগার যা' প্রতি ব্যক্তির যোগ্যতানুযায়ী সুযোগ দেবার জন্য স্বীকৃতি-বদ্ধ তা'ও যদি ব্যক্তির পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ দিতে না পারে তা' হ'লে তার ব্যবস্থাকে কখনোই সমর্থন করা যায় না। সুতরাং শিশু যাতে পরিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর পরিবেশের সুযোগ পেতে পারে তা'র জন্য শিশু-গ্রন্থাগার সাধারণ গ্রন্থাগারের অঙ্গ হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তা' ছাড়াও বিচার্য আছে। জ্ঞানের কোন পরিসীমা নেই। বস্তুতঃ মানুষ যতই জ্ঞানার্জন করে, যতই অজ্ঞাত বিষয়ের সঙ্গে জ্ঞাত বিষয়ের মিলনক্ষেত্রকে দৃষ্টিগোচর করে, ততই জ্ঞানরাজ্য কী বিশাল তা' সে অনুভব করে। নিউটনের উপলখণ্ড ও জ্ঞানসমুদ্র-সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ উক্তিটি তাঁর বিনয়ের নিদর্শন হিসাবেই সাধারণতঃ উল্লিখিত হ'য়ে থাকে। অথচ নিউটনের ঐ উক্তিটি একজন প্রকৃত তথ্যদর্শীর সত্যভাষণ

মাত্র। বাস্তবিক, শিক্ষালাভ করতে যেয়ে যে সব জেনে ফেলেছি ব'লে বুঝ্ল, অথচ না-জানা রাজ্যের বিপুল পরিধির কোন ধারণা মাত্র লাভ কর্তে পার্ল না, সেই পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির মত হাস্যাস্পদ জগতে আর কে আছে? গ্রন্থাগার আমাদের জ্ঞানরাজ্যের সীমার ইঙ্গিত দেবে এটুকু নিশ্চয় এর কাছ থেকে আশা করা যেতে পারে। সুতরাং কোন স্তরেই গ্রন্থাগারের সম্পূর্ণ হ'লে চল্বে না—একে স্বাভাবিক ভাবেই পাঠকদের পরবর্তী স্তরে নিয়ে যেতে হবে। তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ শিশু-গ্রন্থাগার অপেক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগই অধিকতর বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার থাকা আবশ্যক একথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু বিদ্যালয়-গ্রন্থাগার দ্বারা শিশু-গ্রন্থাগারের কাজ চল্তে পারে না। প্রথমতঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার, কিংবা স্বচ্ছন্দ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের পক্ষে অনুকূল কিনা সন্দেহ; দ্বিতীয়তঃ, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে পারদর্শী কর্মী বহুসংখ্যক নিযুক্ত করা সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে হয়ত কিছুটা সম্ভব—বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্ত কঠিন। তৃতীয়তঃ, বিদ্যালয়ের কাজ চলার সময়ে আনুষঙ্গিকভাবে গ্রন্থাগারের কাজ করা হ'লে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব অনেক ক'মে যাবে।

সুতরাং পৃথক্ শিশু-গ্রন্থাগার অপেক্ষা সাধারণ গ্রন্থাগারের শিশু-বিভাগ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। বিশেষ ক'রে এই সাধারণ গ্রন্থাগারে যদি মহিলাদের জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকে তা' হ'লে অনেক ক্ষেত্রে মহিলারাও শিশুদের নিয়ে গ্রন্থাগারে আস্বেন, এবং শিশুও মা'র বা দিদির সঙ্গে গ্রন্থাগারে আস্তে অধিকতর উৎসাহ বোধ করবে। এতেও শিশু-গ্রন্থাগারের পরিবেশ্য সংগ্রহের অনেকখানি সুবিধা হ'তে পার্বে।

কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারের অঙ্গ হিসাবে শিশু-গ্রন্থাগার গঠন করলেও শিশুদের জন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থান থাকা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন রাখা দরকার একথা পূর্বেই প্রতিপন্ন হয়েছে।

কিন্তু বয়স্ক পাঠকদের জন্য নির্দ্ধারিত স্থানের সন্নিকটে ঐ আয়োজন করা হ'লে তাঁ'দের অধ্যয়নের নানাভাবে ব্যাঘাত ঘট্‌বে। এই জন্য বয়স্কদিগের পাঠকক্ষ হ'তে যথেষ্ট দূরে শিশু-গ্রন্থাগারের স্থান হওয়া উচিত। যে সব গ্রন্থাগারে স্বতন্ত্র মহিলা-বিভাগও থাক্‌বে সে সব জায়গায় পুরুষ বয়স্ক পাঠক ও শিশু বিভাগের মধ্যে মহিলা বিভাগের স্থান নির্দিষ্ট কর্‌লে শিশু-বিভাগের গোলমাল আস্‌বার সম্ভাবনা বহুলাংশে ক'মে যেতে পারে।

শিশু-বিভাগের জন্য আস্‌বাবপত্রও বয়স্কদের বিভাগের মত হ'লে চল্‌বে না। বস্তুতঃ শিশু-বিভাগে মুক্তদ্বার (open access) প্রথা প্রবর্ত্তন করা একান্ত ভাবে বাঞ্ছনীয়। প্রথমতঃ, মুক্তদ্বার প্রথায় শিশুদের পুস্তকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আস্‌তে দেওয়া যাবে—এতে শিশুর পাঠের আগ্রহ সমধিক বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, দেখা গেছে শিশুদের দায়িত্ব দিলে তারা দায়িত্বের অপব্যবহার কদাচিৎ ক'রে থাকে—বরঞ্চ নানাভাবে তারা দায়িত্ব পালন কর্‌বারই চেষ্টা করে। ফলে মুক্তদ্বার প্রথা প্রবর্ত্তন ক'রে শিশুদের বিশ্বাস কর্‌লে, শিশুদের দায়িত্ব-জ্ঞান ও নাগরিক কর্ত্তব্য-বোধ জাগ্রত হ'বে। শিশু-বিভাগে মুক্তদ্বার প্রথা প্রবর্ত্তন কর্‌তে হ'লে শুধু চেয়ার টেবিল নয়, আলমারী বা পুস্তকাধারগুলোকেও শিশুদিগের উপযোগী ক'রে নির্ম্মাণ কর্‌তে হ'বে। চেয়ারগুলো সোয়া চৌদ্দ ইঞ্চির চেয়ে বা আলমারীগুলো পাঁচ ফুটের চেয়ে উঁচু হ'লে চল্‌বে না।

শিশু বিভাগেরও তিনটি পৃথক্ শাখা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স্কদের ন্যায় শিশুদের জন্যও একটি reference, একটি lending ও একটি সাময়িক পত্রের বিভাগ থাকা উচিত। Reference শাখা শিশু-বিভাগের একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। বস্তুতঃ নানাবিধ কোষ-গ্রন্থ ব্যবহারের শিক্ষা শিশুদের দিতেই হবে। শিশুমনে যে সমস্ত বিচিত্র

জিজ্ঞাসার উদয় হয় সেগুলি মেটাবার আকর-গ্রন্থগুলো শিশুর হাতে তুলে দেওয়া গ্রন্থাগারের স্বার্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন।

Reference শাখায় সমস্ত শিশুর অবাধ প্রবেশাধিকার থাক্‌লেও lending শাখায় সমস্ত শিশুকেই পরিবেশ্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। শিশুদের পক্ষে ভ্রম এবং অনবধানতা স্বাভাবিক ধর্ম। যারা যত কল্পনাপ্রবণ হয় তারা বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে ততই অমনোযোগী হয়ে থাকে এবং নানা বিষয়ে ভুল ক'রে থাকে। তাই শিশুদের বাড়ীতে ব্যবহার কর্‌বার জন্য বই দিলে যাতে গ্রন্থাগারের ক্ষতি না হয় সেইজন্য শিশুরা Lending Libraryর সুবিধার জন্য আবেদন কর্‌লে সেই আবেদন তাদের অভিভাবকদের অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক।

শিশুদের পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত সাহায্য সর্বদাই প্রয়োজন এই বিশ্বাসে অনেকে বলেন যে যদি শিশু গ্রন্থাগারের পরিবেশ্য সংখ্যা অনেক হয় তবে প্রতিদিনই সকলকে পুস্তক আদান-প্রদানের সুযোগ না দিয়ে সপ্তাহের এক বা দুই দিন প্রত্যেকের জন্য পুস্তক আদান-প্রদানের দিন ব'লে নির্দিষ্ট ক'রে দেওয়া উচিত। সাহায্যের নামে পুস্তক নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয় ব'লে আমাদের বিশ্বাস, তবুও শিশু-গ্রন্থাগারে উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক তত্ত্বাবধায়ক থাক্‌লে শিশুরা আনন্দে তাঁর সাহায্য নিতে চাইবে। তাঁর অবকাশ খুব প্রচুর থাক্‌বে না ব'লেই মনে হয়। অতএব গ্রন্থাগারে হয়ত কখনও কখনও পাঠকের পুস্তক আদান-প্রদানের দিন নির্দিষ্ট ক'রে দেবার প্রয়োজন হ'তে পারে। কিন্তু মনে রাখ্‌তে হবে যে এটা কখনই আদর্শ ব্যবস্থা হ'তে পারে না। অধিক সংখ্যক কর্মী নিযুক্ত ক'রে প্রতি পাঠককে সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়াই গ্রন্থাগারের লক্ষ্য। সঙ্কোচনের মধ্যে নয়, উৎসাহ দানের মধ্যেই গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা ও কৃতিত্ব নির্ভর করে।

Lending Library আলোচনা প্রসঙ্গে আরও দুটো বিষয় বিবেচ্য আছে—শিশুদের একসঙ্গে একাধিক পুস্তক দেওয়া উচিত কিনা, শিশুদের কাহিনী সম্বন্ধীয় পুস্তক নেওয়ার কোনরূপ বাধা নিষেধ থাকা বাঞ্ছনীয় কিনা।

প্রথম প্রসঙ্গ সম্বন্ধে বলা হ'য়ে থাকে যে শিশুরা তুলনামূলক অধ্যয়ন করতে পারে না। সুতরাং তাদের পক্ষে একটা বিষয় পড়্বার জন্য একসঙ্গে একাধিক পুস্তকের প্রয়োজন হয় না। তা'ছাড়া যদি একসঙ্গে একাধিক পুস্তক দেওয়া হয় তবে শিশুরা ঐ সমস্ত পুস্তক প'ড়ে অনেক সময়ের অপব্যয় ক'রে ফেল্বে, আপনাদের পাঠ্যপুস্তক অভ্যাস করবে না। এই যুক্তির মধ্যে কিছুটা সত্য আছে অস্বীকার না করলেও, শিশুদের কখনও কোন অবস্থায়ই একাধিক পুস্তক দেওয়া উচিত নয় একথা সমর্থন করা চলে না। অনেক সময় বিতর্কে যোগদানের জন্য শিশুরা প্রস্তুত হ'তে চায়। তাদের প্রবন্ধাদি লেখ্বারও প্রয়োজন হয়। গ্রন্থাগারিক বা শিক্ষক যদি কোন গ্রন্থের অংশ-বিশেষ নির্দিষ্ট ক'রে পড়্বার নির্দেশ দেন তবে শিশু কেন একাধিক পুস্তক তুলনা ক'রে পড়্তে পার্বে না বলা দুঃসাধ্য। শিশুপাঠ্য ইতিহাসের পুস্তকেও একই ঘটনা সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মতগুলো উল্লিখিত থাকে। যদি এক একটা মতের সমর্থনে সহজ ভাষায় পুস্তক রচিত থাকে তবে ঐ সমস্ত পুস্তক শিশুরা তুলনা ক'রে পড়্তে পার্বে না একথা নিশ্চয় ক'রে বলা কঠিন। তবে সাধারণতঃ কাহিনীমূলক গ্রন্থ শিশুদের এক সঙ্গে একাধিক দিলে তাদের স্কুলের পাঠ্য অবহেলিত হবার পরিপূর্ণ আশঙ্কা আছে। আমার মনে হয় বিশেষ প্রয়োজন প্রতিপন্ন করতে না পারলে শিশুদের একসঙ্গে একখানিমাত্র পুস্তক পড়্তে দেবার নিয়মই অবলম্বনীয়।

শিশুরা যাতে মাত্র কাহিনীমূলক পুস্তক না পড়্তে পারে এজন্য অনেকে বলেন যে পুস্তক আদান-প্রদান বিষয়ে এই নিয়ম করা উচিত

যে একখানি অন্য বিষয়ক গ্রন্থ না পড়া হ'লে পুনরায় কাহিনীর বই দেওয়া হ'বে না। আমি নীতি হিসাবে এ মত সমর্থন করি না। গ্রন্থাগারিক তাঁর বিবিধ আয়োজন ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে যদি কাহিনীতর বিষয়ক পুস্তকে পাঠকের অনুরাগ জন্মাতে না পারেন, তবে সেই ব্যর্থতার জন্য শিশুকে দায়ী ক'রে তার পুস্তক নির্বাচনে অযথা হস্তক্ষেপ করা গ্রন্থাগার-নীতির বিরোধী ব'লেই আমার বিশ্বাস। মনে রাখ্‌তে হবে স্বাধীন পাঠের সুযোগ কেড়ে নিলে গ্রন্থাগার গ্রন্থাগার থাক্‌বে না—স্কুলের প্রসারিত শাখা মাত্র হ'য়ে উঠ্‌বে এবং এর সমস্ত আকর্ষণ চ'লে যাবে।

শিশু-গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন প্রসঙ্গ আলোচনা কর্‌তে গেলে আমাদের উপযুক্ত পুস্তকের দৈন্যের কথাই মনে পড়ে। বস্তুতঃ শিশুদের উপযোগী বই দুর্লভ। প্রচুর ছবির রঙিন রঙের মধ্য দিয়ে শিশুমনকে আকৃষ্ট কর্‌বার মত পুস্তক আমাদের দেশে প্রায় প্রকাশিত হয় না। কোন কোন পুস্তকের মলাটের উপর যদিও বা ভাল ছবি থাকে, কিন্তু তাদের ভেতরের কাগজ যতদূর সম্ভব নিকৃষ্ট হ'য়ে থাকে। শিশুদের পুস্তকের অক্ষর বড় হরপের হওয়া প্রয়োজন। শিশুদের পুস্তকে বিষয়-বস্তুর সঙ্গে যথেষ্ট কল্পনার মসলা থাকা প্রয়োজন। শিশুদের জন্য পুস্তক বৃহদাকারের না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। একথা মিথ্যা যে শিশুরা গল্প ছাড়া কিছুই পড়ে না, বা শিশুর জীবনে এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধানে অধ্যয়ন সাহায্য কর্‌তে পারে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়কে মূল ধ'রে এবং প্রচুর দৃষ্টান্ত দিয়ে লেখা সরস বিজ্ঞান, ইতিহাসের পুস্তক শিশুরা আনন্দেই প'ড়ে থাকে। অবশ্য একথা সত্য তাত্ত্বিক আলোচনা শিশু-মনের উপযোগী নয়—বরঞ্চ তত্ত্বটি আবিষ্কারের কাহিনী তাদের রুচিকর ও উপযোগী। শিশুদের বই হওয়া প্রয়োজন একান্ত ভাবেই পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এমন কি দুষ্প্রাপ্য, মহোপকারী পুস্তকও জীর্ণ হ'য়ে গেলে শিশু-গ্রন্থাগারে তার আর স্থান হ'তে পারে না। বিখ্যাত পুস্তকের

সাধারণ ধারণা শিশুদের দেওয়া উচিত মনে ক'রে অনেক প্রকাশক বিখ্যাত পুস্তকের অতি অকিঞ্চিৎকর সার-সঙ্কলন প্রকাশ করেন। মনে রাখ্‌তে হবে শিশুরা গভীরভাবে অনেকক্ষণ চিন্তা করতে কষ্টবোধ করলেও একেবারে চিন্তা করতে অক্ষম নয়। অসার বস্তু লঘু ব'লেই শিশুর অধ্যয়নের উপযুক্ত হয় না। এই অসার পুস্তককেই শিশুপাঠ্য পুস্তক মনে করা হয় ব'লেই বার্ণার্ড শ' শ্লেষ ক'রে ব'লেছেন উৎকৃষ্ট শিশু-গ্রন্থাগারে শিশুপাঠ্য পুস্তক থাকে না।

শিশু-গ্রন্থাগার সংগঠকদের একটা বিশেষ বিষয় মনে রাখ্‌তে হয়, তা' হ'চ্ছে শৈশবেই গ্রন্থাগার-ব্যবহারের নিয়ম পদ্ধতি শিক্ষা দেবার প্রয়োজন। কেমন ক'রে পুস্তকাধার থেকে পুস্তক নামাতে হয়—পুস্তকের কাগজগুলো যদি ঘটনাক্রমে না কাটা থাকে, তবে তা' কেমন ক'রে কাট্‌তে হয়, হাতে থুথু লাগিয়ে পাতা উল্টাবার দোষ, পাতা মুড়ানোর কুফল, গ্রন্থাগারে নীরব থাকার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি বিষয়ক শিক্ষা শৈশবেই দেওয়া একান্ত কর্তব্য। তা' ছাড়া কেমন ক'রে গ্রন্থ-স্থচী (Catalogue) থেকে পুস্তকের স্থচনা পেতে হয়, কোষগ্রন্থ হ'তে কীভাবে আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ করতে হয় এসব শিক্ষাও এই সময় হ'তেই দেওয়া উচিত। এক কথায় গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে হ'লে যে সমস্ত নিয়ম-শৃঙ্খলা পালন করা প্রয়োজন তা' এই সময়েই শিশুকে অভ্যাস করিয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার যে সমস্ত উপকরণের দ্বারা আমাদের সহায়তা করে তাদের যথোপযুক্ত ব্যবহারও এই সময়েই শেখানো আবশ্যক।

স্থূল কথা স্থগঠিত, স্থপরিচালিত, শিশু-গ্রন্থাগার আমাদের দেশে এমন পাঠক স্থষ্টি করতে পারবে যারা গোড়ার থেকেই গ্রন্থাগার-মনা হ'য়ে বেড়ে উঠে গ্রন্থাগারকে সার্থকভাবে ব্যবহার ক'রতে শিখ্‌বে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করতে পারবে এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের দ্বারা আমাদের জাতীয় গৌরবকে বিশেষভাবে বর্ধিত করতে পারবে।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার বয়স্কশিক্ষার পক্ষে এতই অপরিহার্য ব'লে প্রতিপন্ন হ'য়েছে যে সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্রে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থাপনার মতই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা আবশ্যিক কর্তব্য ব'লে বিবেচিত হ'য়ে থাকে। প্রত্যেক পল্লী ও জনপদে, সমস্ত নাগরিকদের নিঃশুল্কভাবে ব্যবহার্য গ্রন্থাগার ওসব দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর জন্য যে গৃহ, আসবাব প্রভৃতির ব্যয় প্রয়োজন রাষ্ট্র অকুণ্ঠিত ভাবে তা' বহন ক'রছে। কিন্তু যে সব স্থানের জনসংখ্যা খুব নগণ্য, যেখানে অনেক ছাড়াছাড়িভাবে মানুষের বসতি সেখানে এই রকমভাবে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করার যে বিপুল ব্যয় তার সার্থকতা কতটা এই প্রশ্ন অতি সহজেই ঐ সব রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মনে জেগেছে। বস্তুতঃ ঘনসন্নিবিষ্ট বাসস্থান নিয়ে যে পল্লী গ'ড়ে উঠেছে তার মাঝখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রলে অতি সহজেই গ্রন্থাগার বহুলোকের সেবার মধ্য দিয়ে আপনার সার্থকতা প্রতিপন্ন ক'রতে পারে। কিন্তু যেখানে লোকবসতি এতই বিরল যে অধিকাংশ লোককে গ্রন্থাগারে পৌঁছুতে হ'লে অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে আস্‌তে হবে সেখানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'লেও তা' তার পরিচালনার ব্যয় অনুযায়ী কাজ দিতে পারে কিনা সন্দেহ। পার্শ্ববর্তী সামান্য কয়েকজন লোকের প্রয়োজনের জন্য একটা পুরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা লাভজনক কিনা সন্দেহ, আর দূরের লোকদেরও ঐ গ্রন্থাগারে এসে বই নিতে গেলে যে পরিমাণ সময়ক্ষেপ ও ভ্রমণ-ব্যয় ক'রতে হবে—তা' করা সম্ভব কিনা সন্দেহ। তা' ছাড়া এই ব্যয় ক'রতে হ'লে তাদের অন্য নাগরিকদের তুলনায় অসুবিধা ভোগ ক'রতে হ'ল ব'লে মনে হওয়া অসম্ভব নয়। নাগরিকদের পরস্পরের মধ্যে সুযোগ সুবিধার সমতা বিধানের চেষ্টা করা সব রাষ্ট্রেরই

উচিত। তাই বিরল-বসতি জনপদের মধ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা না ক'রে ঐ সব জায়গার জন্য ওসব দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হয়।

গ্রন্থাগারকে লোকের ঘরের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া গ্রন্থাগার আন্দোলনের চরম আদর্শের কথা। বস্তুতঃ প্রত্যেক লোকের জন্যই গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, এই নীতিতে বিশ্বাস করলে আর এই নীতিকে কাজে পরিণত করতে চাইলে রাষ্ট্রকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রবর্তন ক'রতেই হয়। পাঠক যদি গ্রন্থাগারে যাবার অবসর না পায়, গ্রন্থাগারই যাবে এগিয়ে পাঠকের কাছে। খরিদ্দার যদি দোকানে না আসে দোকানী মাল পাঠাবে খরিদ্দারের বাড়ী। বস্তুতঃ মাল পাঠানোয় দোকানীর যেরূপ আগ্রহ বই পড়ানোয় গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের সেই রকম আগ্রহ থাকাই হচ্ছে গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল কথা। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, গ্রন্থাগার-কর্তৃপক্ষের এই মনোভাবকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ ক'রতে যে সব চেয়ে বেশী সাহায্য করে একথা বলাই বাহুল্য। তাই গ্রন্থাগার আন্দোলনে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান ও প্রভাব এত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রগতিশীল দেশগুলোর কথা যাই হোক্ না কেন, আমাদের দেশে গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের স্থান কী, এ কথা আমাদের স্বতন্ত্রভাবে ভেবে দেখা দরকার। আমাদের দেশে সর্বসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সরকার কার্যতঃ মেনে নিলেও আইনগতভাবে এখনও মেনে নেন নি'। জনশিক্ষার অগ্রগতিও আমাদের দেশে এখনও খুব আশাপ্রদ নয়। আমাদের দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই এখনও বেসরকারী ব্যক্তিবৃন্দ বা প্রতিষ্ঠানের দ্বারা পরিচালিত। জনসাধারণের দান বা চাঁদাই ঐ সব গ্রন্থাগারের এখনও প্রধান নির্ভর। প্রধান প্রধান সহরেও পৌর প্রতিষ্ঠান বা সরকার জনসাধারণের জন্য নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি'।

এই রকম অবস্থায় বিদেশীদের—যারা দেশের ঘনবসতি অঞ্চলের সর্বত্র নিঃশুল্ক সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ক'রে বিরল-বসতি অঞ্চলের জনগণের সুবিধার জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রচলন ক'রেছে—তাদের অনুকরণের সুযোগ বা প্রশ্ন কোথায় ?

এই আলোচনার থেকে তা' হ'লে কি এই বুঝ্‌তে হবে যে আমাদের দেশে এখনও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিন আসে নি' ? আমাদের দেশে ঘনবসতি অঞ্চলগুলোই শিক্ষায় সমৃদ্ধিতে সম্পন্ন। সুতরাং এই সব জায়গায় ভাল গ্রন্থাগার সহজেই গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে। আগে আমাদের সমস্ত শক্তি এ দিকে নিযুক্ত ক'রে এ সব জায়গায় নিঃশুল্ক জনসাধারণের গ্রন্থাগার গ'ড়ে তুলে তবে বিরলবসতি অঞ্চলের লোকদের সেবার জন্য অগ্রসর হওয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

কিন্তু না—আমাদের আলোচনার উদ্দেশ্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধতা করা নয়। বস্তুতঃ আমাদের দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যে বিদেশের চেয়ে অনেক বেশী সেকথা প্রতিপন্ন কর্‌বার জন্যই ওদেশ আর এদেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার বৈষম্যের কথা তোলা হ'য়েছে। আমাদের শিল্পাঞ্চল বা ঘনবসতি অঞ্চলের শিক্ষিত-প্রধান অধিবাসীরা যেমন তেমন ক'রে তাদের মত গ্রন্থাগারের একটা ব্যবস্থা করার চেষ্টা ক'রেছে। এ চেষ্টাকে সার্থক ক'রে তুল্‌তে রাষ্ট্রের সাহায্য অপরিহার্য একথা মানি—কিন্তু রাষ্ট্রের বিনা সাহায্যে বা সামান্য সাহায্যে যে সব প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠেছে তা' দিয়ে যে জনসাধারণের কাজ অনেকটা চ'লে যাচ্ছে এ তথ্যও ত' অস্বীকার করা যায় না। তাই ঘনবসতি অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যাও বা আছে—বিরল-বসতি অঞ্চলে তাও নেই। সুতরাং রাষ্ট্রের বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টায় যদি এ সব অঞ্চলের গ্রন্থাগার-প্রয়োজন খানিকটা মেটে তা' কি বাঞ্ছনীয় নয় ? গ্রন্থাগার-ব্যবহার অভ্যাস করিয়ে দিতে

পার্‌লে তবেই না গ্রন্থাগার অপরিহার্য ব'লে মনে হবে, তবেই না গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা না থাকাটা অসহনীয় হ'য়ে উঠ্‌বে। বস্তুতঃ সকলের জন্য গ্রন্থাগার দরকার এটা প্রতিপন্ন ক'র্‌তে হ'লে চায়ের নেশার মত গ্রন্থাগারের নেশা সব শ্রেণীতে ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের দাবী মেটাবার জন্য যদি প্রগতিশীল দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার অপরিহার্য ব'লে মনে হয়, গ্রন্থাগার-আন্দোলন সৃষ্টি কর্‌বার জন্য আমাদের দেশেও ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের প্রচলন প্রয়োজনীয়।

তা' ছাড়া আমাদের দেশে সরকার-পরিচালিত সাধারণ গ্রন্থাগার নেই ব'লে অধিকাংশ গ্রন্থাগারেরই আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। ভাল ভাবে জনসাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ ক'র্‌তে হ'লে গ্রন্থাগারের যেমন কর্মী থাকা প্রয়োজন গ্রন্থাগারগুলোর বর্তমান আর্থিক অবস্থায় তেমন কর্মী সংগ্রহ করা খুবই কঠিন। এই জন্য বই-দেওয়া-নেওয়ার কাজটুকু বর্তমান গ্রন্থাগারের দ্বারা চ'ল্‌লেও গ্রন্থাগারের কাছ থেকে কী পাওয়া যেতে পারে এই ধারণা সৃষ্টির কাজ এর দ্বারা সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলোর কাছ থেকে এই কাজ আশা করা খুব অন্যায় হবে না। কেননা আমাদের দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলো প্রতিষ্ঠিতই হ'তে চ'লেছে সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং সেবাকার্যে যারা পারদর্শী সেইরকম কর্মী অবশ্যই এই কাজে আত্মনিয়োগ ক'র্‌বে। তাই তারা জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারকে ঠিক্‌ভাবে কেমন ক'রে ব্যবহার করা যায়, এ শিক্ষা দিতে পার্‌বে এটা খুবই আশা করা যায়।

আমাদের সর্বশেষ আলোচনার থেকেই আমাদের দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের নতুন ভূমিকার কথা প্রতিপন্ন হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বিরলবসতি অঞ্চলে গ্রন্থ লেনদেনের কাজটুকু ক'র্‌তে পারলেই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ শেষ হ'য়ে গেল—কিন্তু আমাদের দেশে ভ্রাম্যমাণ

গ্রন্থাগারকে—গ্রন্থাগারের প্রকৃত স্বরূপ কী, এর কার্যকারিতা কতখানি, এর ব্যবহার কেমন ক'রে করতে হবে এ সব শিক্ষা দেবার দায়িত্বও নিতে হবে। বড় বড় সহরে বা তাদের উপকণ্ঠে, হয়ত সরকারী বা বিদেশী বিখ্যাত গ্রন্থাগারের আদর্শ বা প্রভাব অনুভূত হ'তে পারে, কিন্তু সহর থেকে দূরের পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার থাকলেও সেখানে এই সব শিক্ষা দেবার লোক পাওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট। তাই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে আপনার সুসজ্জিত গ্রন্থের সঙ্গে সঙ্গে সুশিক্ষিত কর্মিদল নিয়ে পল্লী থেকে পল্লীতে ঘুরে বেড়িয়ে গ্রন্থাগার ব্যবহারের প্রকৃত কথাটি প্রচার করার দায়িত্ব নিতে হবে।

এই সঙ্গে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলোর উপর আরও একটা দায়িত্ব আসার সম্ভাবনা র'য়েছে। আমাদের দেশে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'তে চ'লেছে প্রধানতঃ সরকারী আনুকূল্যে ও পরিচালনায়। সরকার স্বভাবতঃই এক একটা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য এক একটা প্রতিষ্ঠান তৈরী ক'রে তাদের হাতে এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যয়ের অর্থ দেবেন। স্বভাবতঃই ঐ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সব গ্রন্থাগারগুলোকে সুসংবদ্ধ ক'রে তোলা, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা সৃষ্টি করা এবং তাদের প্রয়োজনমত গ্রন্থ সরবরাহ করা ঐ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলোর লক্ষ্য হবে। স্বভাবতঃই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলোকে এই কাজে ব্যবহার করা হবে। আঞ্চলিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারগুলোর থেকে ঐ অঞ্চলের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোতে বই দেওয়া নেওয়ার কাজ করবার জন্যও এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলোকে ব্যবহার করার খুবই সম্ভাবনা র'য়েছে।

বস্তুতঃ আমাদের দেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলোকে এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে সংযোগের এবং গ্রন্থাগার-আন্দোলন প্রচারের অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্যও নিযুক্ত করতে হ'বে। অন্যান্য দেশের মত বিরল-বসতি অঞ্চলে পুস্তক লেনদেন মাত্র করলে এর কর্তব্য সম্পন্ন হবে

না। এমন কি আমাদের দেশের গ্রন্থাগার-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেকের মতে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সরাসরি লেনদেনের কাজটা এখন মোটেই করার দরকার হবে না। সকলের জন্য গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার চিন্তা আমাদের দেশে এখনও স্বপ্ন-বিলাস মাত্র। এমন অবস্থায় দূর-দুরান্তরে যেখানকার মানুষদের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক যোগাযোগ অত্যন্ত কম তাদের বই দিতে যাওয়ায় বই হারাবার যে বিপুল সম্ভাবনা র'য়েছে সে ঝুঁকি বর্তমান অবস্থায় আমাদের নেওয়াই উচিত নয়। তাঁদের মতে পল্লীর ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলো নামে গ্রন্থাগার হ'লেও সেখানের পুস্তকসংগ্রহ এমনই বৈচিত্র্যহীন এবং এতই অকিঞ্চিৎকর যে সেগুলোকে গ্রন্থাগারের প্রকৃত মর্যাদা দেওয়া সুকঠিন। বস্তুতঃ এ সব প্রতিষ্ঠান-গুলোর গ্রন্থাগার-আন্দোলনে তাঁদের মতে একটিই মূল্য আছে। সেটা হ'চ্ছে এমন কয়েকজন কর্মীকে উপস্থাপিত করা যাঁদের দায়িত্বে ঐ অঞ্চলের লোকদের বই ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া যায়। এঁদের উপদেশ হ'চ্ছে সকলকে বই দেওয়ার বৃথা স্বপ্ন-বিলাসে গা না ভাসিয়ে বই ধার দেওয়া হোক্ এই সব গ্রন্থাগারকে, আর তাদের মাধ্যমে বই জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যাক্। এতে বই হারানোর সম্ভাবনা কম থাক্‌বে, গ্রন্থাগারগুলো জনপ্রিয় হ'তে পার্‌বে, লোকের পাঠের রুচি ও অভ্যাস গ'ড়ে উঠ্‌বে, ফলে গ্রন্থাগারগুলোও ঠিক্ পথে চল্‌তে পার্‌বে।

উল্লিখিত মতের বিস্তৃত আলোচনা না ক'রে এটুক বলা যেতে পারে যে পল্লীতে যদি প্রকৃত গ্রন্থাগার না থাকে, তবে তাকে যথাযথভাবে পরিপুষ্ট ক'রে তোলার জন্য যে সাহায্য দেওয়া দরকার তা' দিতেই হবে। যদি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্যই এই বিষয়ে সব চেয়ে কার্যকরী হয়, তবে নিঃসঙ্কোচে এ বিষয়ে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে হবে। কিন্তু তাই ব'লে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কার্যকে এইটুকুর মধ্যে সঙ্কুচিত করা উচিত হবে না। বস্তুতঃ নিয়মিত যাতায়াত করতে

পার্‌লে কোন অঞ্চলে বই হারাবার খুব বেশী কথা নয়। কোন সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠককে পড়্‌তে বই দিলে যতখানি ঝুঁকি নিতে হয়, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে তার বেশী ঝুঁকি নিতে হয়, একথা অতি সাবধানীরাই শুধু ব'ল্‌বেন।

ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা এখানেই শেষ ক'রে এর গঠন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে সংক্ষেপে দু'একটা কথার অবতারণা করা হবে।

আমাদের দেশে অনগ্রসর পল্লী অঞ্চলের বহুত্র সারা বৎসরে ব্যবহার করা যেতে পারে এমন পাকা রাস্তার সংখ্যা বেশী নয়। তাই এখানে মোটর গাড়ীকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগাররূপে ব্যবহার করা যাবে কিনা সন্দেহ। বস্তুতঃ মাদ্রাজে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার প্রবর্তন কর্‌তে যেয়ে একবার বলদ-চালিত গাড়ীকেই ব্যবহার করা হ'য়েছিল। কিন্তু আমাদের দেশে বর্ষাকাল মোটামুটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ব'লে এবং বর্ষাকালে বস্তুতঃই পল্লীগ্রামের লোকদের পক্ষে গ্রন্থাগার ব্যবহারে আগ্রহ প্রদর্শন করার কার্যতঃ অসুবিধা থাকার জন্য আপাততঃ বর্ষাকালে আমরা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ খুব বেশী কর্‌তে পার্‌ব ব'লে মনে হয় না। আর তাই যদি না পারা যায় তা' হ'লে বলদ পোষার হাঙ্গামা সহ্য ক'রে মোটরগাড়ির বহু বেশীগুণ গতিবেগের সুবিধা হারাবার কোনই সঙ্গত কারণ থাকে না। তাই মোটর গাড়ীতেই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার সংগঠন করা উচিত। পল্লী অঞ্চলের অনেক রাস্তাই অত্যন্ত স্বল্পপরিসর হওয়ায়, এবং সেগুলোর পেছনে যথোচিত যত্ন না নেওয়ায় সে সব রাস্তা দিয়ে মোটরের যাওয়া আসা করা অবশ্য অসম্ভব। সে সব জায়গায় যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন কর্‌তেই হবে। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের পুলিশের থানার বা মহকুমা সহরে যাতায়াতের জন্য চলনসই রাস্তা, যা' বর্ষা ছাড়া অন্য

সময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে তা', অনেক ক্ষেত্রেই আছে। সুতরাং এই সব রাস্তাকে মূল ধ'রে মোটর-বাহিত ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা অন্যায় হবে না।

এই সব রাস্তার যেখান থেকে অনগ্রসর পল্লীর পায়ে-চলার রাস্তা-গুলো বেরিয়েছে, সেই সব জায়গায় বই পাঠাবার জন্য বাইসিক্লের পেছনের কেরিয়ারে ক'রে পুস্তকবাহী বাক্স পাঠান যেতে পারে। বাই-সিক্ল ও কর্মী সরবরাহ করার দায়িত্ব সেই পল্লীর লোকদের উপর চাপিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়, না পারলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপকদেরই ঐ বাইসিক্ল সংগ্রহ ক'রে কাজ করার দায়িত্ব নিতে হবে। বস্তুতঃ মোটর গাড়ীর ছাদের উপর প্রয়োজনমত এক আধখানা বাইসিক্ল এবং গাড়ীর মধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত বইয়ের বাক্স বহন করা মোটেই কঠিন কাজ নয়।

আমাদের দেশের রাস্তাঘাটের বল ও অবস্থা বিবেচনা করলে কোন অবস্থায়ই পৌনে এক টনের বেশী ভারের মোটর গাড়ীকে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের জন্য ব্যবহার করা উচিত ব'লে মনে হবে না। গাড়ীর চেসিস্ কিনে প্রয়োজনমত বডি তৈরী করিয়ে নিতে হবে। এই গাড়ী তৈরী করানোর সময় আমাদের গোটাকতক কথা মনে রাখতে হবে। সব প্রথম মনে রাখতে হবে আমাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে (১) বই দেওয়া নেওয়ার বাহকের কাজ, (২) পুরাপুরি গ্রন্থাগারের কাজ, এবং (৩) গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রচারকার্যের দায়িত্ব, সম্পাদন করতে হবে। তাই সাধারণ ট্রাক্—যা বই বাহনের প্রথম কাজটি বেশ সহজেই করতে পারে—তা' দিয়ে আমাদের কাজ চ'লবে না। কিংবা বিদেশের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার যা' প্রধানতঃ পার্কে, স্কুলে, বিরলবসতি অঞ্চলে কিংবা অন্যত্র পুরাপুরি গ্রন্থাগারের কর্তব্য মাত্র সম্পাদন করে তা' দিয়েও আমাদের কাজ চ'লবে না। আমাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে

সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোতে পুস্তক বহনের ব্যবস্থা থাকা দরকার, ছোট খাট সাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয় সব কিছু থাকা দরকার এবং আরও দরকার সিনেমা, ছায়াচিত্র, গ্রামোফোন প্রভৃতি বহনের ব্যবস্থা। উপযুক্তসংখ্যক কুশল কর্মীরও আসন থাকা দরকার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারে।

উপরে বিবৃত প্রয়োজনের সঙ্গে একমত হ'তে পারলে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের গঠন সম্বন্ধে খুব বেশী মতভেদ থাকার কথা নয়। চালকের আসনের পেছনে একটা ছোট কামরা ক'রলে কর্মীদের বহনের সুবিধা হবে। একই দরজা দিয়ে চালক ও কর্মীরা তাঁদের নির্দিষ্ট জায়গায় প্রবেশ করতে পারেন। কর্মীরা প্রবেশ করলে চালকের কামরার খালি জায়গায় বইয়ের বাক্স রাখা যেতে পারে। এই বইগুলো সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেবার জন্য কেন্দ্র থেকে আগেই গোছানো ও বাক্স-বন্দী হ'য়ে থাকবে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারকে যদি সব কাজ ভালভাবে করতে হয় তবে একই দিনে অনেক বেশী জায়গায় বই বহনের দায়িত্ব এ নিতে পারবে না। ফলে বইয়ের বাক্সের সংখ্যা এত হবে না যা' চালকের কামরার খালি অংশে রাখা যাবে না। আর যদি তা' হয়ই তবে ঐ বাক্সগুলোকে গাড়ীর ভেতরেও রাখা চলবে। কিন্তু চালকের পাশেই কর্মিদল থাকবে ব'লে, আর ওখানে হাতের কাছে দরজা আছে ব'লে, যতবেশী সম্ভব বাক্স ওখানে রাখলেই লেনদেনের সুবিধা হবে।

তারপর গাড়ীর দু'ধারে থাকবে সাজান বই। এগুলোর আবরণ থাকবে বাইরের দিকে। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট জায়গায় একসঙ্গে অনেকক্ষণ থেকে গ্রন্থাগারের কাজ করবে। তখন কর্মীরা পাঠকদের সাহায্য ক'রতে নেমে আসবেন। আর দু'ধারের বইয়ের বাইরের দিক্‌কার আবরণ তুলে দিলে পাঠকরা বই দেখতে পারবেন। আমার ব্যক্তিগত মত হ'চ্ছে এই দু'ধারের বইগুলোর মধ্যে সাধারণতঃ কাহিনীমূলক বই বেশী থাকা উচিত নয় এবং এর থেকে বই বাড়ীতে থাকা

দেওয়া উচিত নয়। অবশ্য এই দু'ধার ছাড়াও কর্মীদের বস্‌বার পেছনে বই রাখ্‌বার জায়গা থাক্‌বে, সেইখানে এই সব বইয়ের একখানা ক'রে অতিরিক্ত প্রতিলিপি রাখা যেতে পারে এবং পাঠকদের চাহিদা মত তা'র থেকে বই বাড়ীতে পড়্‌বার জন্যও ধার দেওয়া যেতে পারে। বাড়ীতে পড়্‌তে দেবার জন্য কাহিনীমূলক বইয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে একথা কোন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিকই অস্বীকার ক'র্‌বেন না।

একথা বলা বাহুল্য বাইরের দিকে আবরণ ক'রে বই রাখার ব্যবস্থা করায় বইয়ের দিকে নজর রাখার জন্য বেশী কর্মীর দরকার। তবুও আমার বিবেচনায় এই ব্যবস্থাই যুক্তিযুক্ত। কেননা এ ব্যবস্থা জনচিত্তা-কর্ষক। তা'ছাড়া পল্লীতে ছায়াচিত্র দেখিয়ে গ্রন্থাগার আন্দোলনের বাণী আমরা প্রচার কর্‌তে চাই ব'লে আলোকচিত্রের যন্ত্র প্রভৃতি দিয়ে গাড়ীর মধ্যভাগের খানিকটাকে অন্ততঃ বোঝাই রাখ্‌তেই হবে। বাইরের পাঠককে এই অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বইয়ের কাছে যাতায়াত কর্‌তে দেওয়া তাই উচিত হবে না। তা' ছাড়া আমাদের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কর্মী থাক্‌বেই—সুতরাং বইগুলোর উপর নজর রাখার জন্য কর্মীর অভাবের কথা উঠ্‌তেই পারে না।

বস্তুতঃ ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের কাজ ভাল ক'রে ক'র্‌তে পার্‌লে আমাদের অনগ্রসর অঞ্চলের লোকেরাও বই পড়্‌তে অভ্যস্ত হ'তে পার্‌বে, আমাদের পল্লীর অকিঞ্চিৎকর পুস্তক সংগ্রহগুলোও প্রকৃত গ্রন্থাগারের দায়িত্ব নিতে পার্‌বে এবং গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্বন্ধে লোকের মনে সঠিক ধারণা জন্মাতে পার্‌বে। তাই লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের অঙ্গ হিসাবে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আজ অতি প্রয়োজনীয়।

প্রচার

গ্রন্থাগারের যাবতীয় সুবিধা থাকা সত্ত্বেও প্রগতিশীল দেশগুলোতে পর্যন্ত এত কম সংখ্যক লোক কার্যতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহার ক'রে থাকে যে মনে হয়, হয় দেশের অধিকাংশ লোক গ্রন্থাগারের অবস্থিতির খবরই জানে না, না হয় গ্রন্থাগার বাস্তবিক জনসেবার জন্য কত কিছু ক'র্‌তে পারে সে সম্বন্ধে তাদের কোনও ধারণাই নেই। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তথা সমঝদার লোকেরা যে সব বইকে খুব দামী বা দরকারী ব'লে মনে করেন অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বছরের পর বছর ঐ সব বই অব্যবহৃত অবস্থায় প'ড়ে থেকে ধুলোকালিতে ভ'রে উঠেছে। সুতরাং নতুন পাঠক সংগ্রহ কর্‌বার জন্য, গ্রন্থাগারের ভাল বই এবং তার আলোচিত বিষয়ের গুরুত্বের খবর পাঠকদের জানিয়ে দেবার জন্য, গ্রন্থাগারের প্রচারকার্যের সুবন্দোবস্ত থাকা চাই। গ্রন্থাগার যদি রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত হ'তে চায়, তবে তাকে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক লোকের মধ্যে আপন প্রভাব বিস্তার ক'রে আপনার গুরুত্ব প্রতিপন্ন কর্‌তেই হবে।

গ্রন্থাগারের প্রচারকার্যের মূল লক্ষ্য হ'চ্ছে দু'টি—(১) অধিকসংখ্যক পাঠক সংগ্রহ করা, (২) নিয়মিত পাঠকদের ভাল রুচি সৃষ্টি ক'রে তাদের ভাল বই প'ড়্‌তে উদ্বুদ্ধ করা।

এই দুটো উদ্দেশ্যকেই সার্থক ক'রে তুল্‌তে হ'লে গ্রন্থাগারকে কতক গুলো সুপরিকল্পিত নীতি অনুসরণ ক'রে চল্‌তে হবে। অবশ্য প্রচারের যে পদ্ধতিই আমরা অবলম্বন করি না কেন, গ্রন্থাগারটি মূলতঃ ভাল না হ'লে মাত্র প্রচারের জয়ঢাক একে বড় ক'রে তুল্‌তে পার্‌বে না। বস্তুতঃ সুপরিচালিত, সেবাপরায়ণ, ভাল গ্রন্থাগার নিজের কাজের দ্বারাই নিজের প্রচার ক'রে থাকে। সন্তুষ্ট পাঠকদের মুখে মুখেই এর সার্থকতার

খবর ও জয় জয় কার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তবুও উন্নতিকামী গ্রন্থাগারকে সক্রিয়ভাবে খানিকটা প্রচারকার্য করতেই হয়।

যে গ্রন্থাগারিক আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিবৃদ্ধি ও প্রসার চান, তাঁকে আপনার সমস্ত গ্রন্থসম্পদের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানতে হবে—তাঁকে স্থানীয় বিভিন্ন প্রকারের সব রকম সাংস্কৃতিক ও অন্যবিধ প্রতিষ্ঠানের খবর রাখতে হবে। তাঁকে ঐ অঞ্চলের জনহিতকর কার্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিচিত হ'তে হবে। এর দ্বারা ঐ সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নানাবিধ অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগার কী ভাবে সাহায্য করতে পারবে তা' অনুমান করা গ্রন্থাগারিকের পক্ষে সম্ভব হবে, এবং তিনি অযাচিতভাবে ঠিক সময় তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দান ক'রে অনেকগুলি লোকের সঙ্গে গ্রন্থাগারের পরিচয় করিয়ে দিতে পারবেন। খুবই আশা করা যায় এর ফলে তাঁর গ্রন্থাগারে নতুন পাঠকের সংখ্যা কিছু অন্ততঃ বৃদ্ধি পাবেই।

এ ছাড়াও গ্রন্থাগারিক যদি ভাল বক্তৃতা করতে পারেন, বেশ মিশুক মিশুক হন এবং সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অভিজ্ঞ হন তা' হ'লে ঐ অঞ্চলের সভাসমিতিতেও দু'কথা বলবার জন্য তাঁর নিমন্ত্রণ হবে। কুশল বক্তা হ'লে ঐ সব সুযোগে গ্রন্থাগারিক শ্রোতাদের মধ্যে গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করতে পারবেন। অবশ্য এই সব অনুষ্ঠানে সরাসরি নিজের গ্রন্থাগারের প্রচার করা ঠিক্ হবে না। কেননা এ প্রচার প্রায়শঃই হবে অপ্রাসঙ্গিক এবং অনেকের পক্ষে বিরক্তিকর। তাই ঠিক্‌ভাবে ব'লতে না পারলে বক্তৃতায় সুফল ফলা কঠিন।

গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সভা-সমিতি করতে দেওয়া উচিত কিনা, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। যে সব গ্রন্থাগারের পৃথক্ বক্তৃতার জায়গা আছে তাদের বাদ দিলে অন্য গ্রন্থাগারের নিজেরও বেশী বক্তৃতার আয়োজন, অনেক পাঠক খুব সুনজরে দেখেন না—

কেননা এর দ্বারা গ্রন্থাগারের প্রতিশ্রুত সেবাকাজের ব্যাঘাত জন্মায়। তবুও গ্রন্থাগারের নিয়মিত কাজের অসুবিধা না ঘটিয়ে গ্রন্থাগার-গৃহে বক্তৃতার ব্যবস্থা কর্‌লে, বিশেষ ক'রে যে সব বক্তৃতায় নানাবিধ গ্রন্থের খবর জানিয়ে দেবার বা আলোচনার সুযোগ থাকে সেই জাতীয় বক্তৃতার ব্যবস্থা কর্‌লে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তাই হবে। অবশ্য সরাসরি গ্রন্থের প্রচার-মূলক বক্তৃতার চেয়েও সাধারণ বক্তৃতার প্রসঙ্গে গ্রন্থের প্রচার কর্‌লেই বেশী ফল পাওয়ার কথা। তা'ছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগারে এসে বক্তৃতাদি কর্‌লে গ্রন্থাগার যাদের আকর্ষণ কর্‌তে পারে নি' তাদের মধ্যেও গ্রন্থাগারের প্রচার হয়।

গ্রন্থাগারের সুলিখিত বার্ষিক বিবরণীও গ্রন্থাগারের প্রচারের অনেকখানি সাহায্য কর্‌তে পারে। কিন্তু এই বিবরণীগুলো স্বতন্ত্রভাবে মুদ্রিত ও প্রচারিত হ'লে এদের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপিত হয় না। খুব আগ্রহশীল লোক ছাড়া অপরে এগুলোর পাতা উল্‌টিয়েও দেখেন না। কিন্তু যদি খবরের কাগজে এই বিবরণ:প্রকাশ করা যায় তাহ'লে অনেক ভাল ফল পাবার সম্ভাবনা থাকে। বেশী কয়েকখানা কাগজ কিন্‌বার প্রতিশ্রুতি দিলে অনেক কাগজই এই বিবরণ ছেপে বের কর্‌তে রাজী হয়। ঐ অতিরিক্ত কাগজগুলোই গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ তাঁদের বিবরণরূপে বিতরণ কর্‌তে পারেন। এতে খরচের খুব বেশী তফাৎ হবারও কথা নয়।

প্রচার সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু আলোচনা ক'রে আমরা পুস্তক প্রচারের বিশেষ নীতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে দুই একটা কথার উল্লেখ কর্‌ব। পুস্তক সংগ্রহ করার পরই সব গ্রন্থাগারিক চান যে ঐ সংগৃহীত বইগুলো পাঠকেরা পড়ুন। সেই জন্য সংগৃহীত পুস্তকগুলোকে লোকের চোখের সাম্‌নে ধরা দরকার। যে পাঠকের অনুরোধক্রমে কোন বই কেনা হয়, বই আসা মাত্র ভদ্রতার খাতিরে এবং বই ব্যবহৃত হোক্

এই উদ্দেশ্যে তাঁকে বই আসার সংবাদ দেওয়া হয়। তার পর অন্য উপায়ে পাঠক সাধারণকে ঐসব বই সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত ক'রে তোলার চেষ্টা হয়।

এ কথা বলা বাহুল্য যে যদি গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহ আশানুরূপ না হয় বা পুস্তক-নির্বাচনের পদ্ধতিগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করা না হ'য়ে থাকে তা' হ'লে পাঠকদের ভাল বই পড়ানোর চেষ্টা সার্থক হ'তে পারে না। পুস্তক-সংগ্রহ যদি আশানুরূপ হয়, বইগুলোকে যদি যথাযথভাবে গ্রন্থবর্গ হিসাবে সাজিয়ে রাখা হয়, গ্রন্থসূচী যদি নিয়মিতভাবে নির্মিত হয়, তবে এর দ্বারাই গ্রন্থাগারের সংগ্রহকে জানিয়ে দেওয়ার কাজ অনেক দূর এগিয়ে দেওয়া যায়। অনেক গ্রন্থাগারিক মনে করেন যে মধ্যে মধ্যে বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের অবস্থিতি ও গুরুত্বের বিষয় পাঠক সাধারণকে জানানো দরকার। যদি দেখা যায়, কোন বিষয় সম্বন্ধে একখানি বিশেষ ভাল বই আশানুরূপ ব্যবহৃত হ'চ্ছে না, তা'হলে বুঝ্‌তে হবে খুব সম্ভবতঃ বইখানির প্রচার দরকার। বই প্রচারে সাধারণতঃ নিম্নবর্ণিত পন্থাগুলির অনুসরণ করা হয়:—

(১) সূচনার সাহায্যে প্রচার—প্রচার পত্র, সাময়িক পত্রিকা, গ্রন্থ-সূচী, নির্দেশনামা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির সাহায্যে কোন গ্রন্থের গুরুত্ব বা অবস্থিতির কথা জানিয়ে দেওয়াকেই সূচনার সাহায্যে প্রচার বলা হ'য়ে থাকে।

(২) আলাপ-আলোচনার সাহায্যে প্রচার—পাঠকের সঙ্গে যদি মুখোমুখি কথা বল্‌বার সুযোগ পাওয়া যায়, তা'হ'লে আমরা তাদের অনেক বইয়ের খবর বল্‌তে পারি, এবং অনেক সময় হয়ত তাদের দিয়ে ইচ্ছামত বই পড়িয়েও নিতে পারি। বক্তৃতার সাহায্যে পুস্তকের প্রচারও প্রচারের এই শ্রেণীরই মধ্যে পড়ে। যথাযথভাবে চালাতে পার্‌লে এই জাতীয় প্রচারে সুফল পাওয়া গেলেও, বাড়াবাড়ি হ'লেই

এতে পাঠকের স্বাধীনতা ও স্বকীয় চিন্তাধারাকে অনেকাংশে সঙ্কুচিত করার আশঙ্কা আছে।

(৩) বর্গীকরণের সাহায্যে প্রচার—এক বিষয়ের নানা বইকে একত্র ক'রে বর্গ হিসাবে বইগুলোকে সাজিয়ে রাখ্‌লে গ্রন্থের খুব ভাল প্রচার করা হয়। সাধারণতঃ পাঠকদের যে বিষয় সম্বন্ধে স্বাভাবিক আগ্রহ থাকে সেই বিষয়েরই বইয়ের খোঁজ রাখ্‌বার বা পড়্‌বার ইচ্ছা হয়। সুতরাং পাঠক নিজের প্রিয় বিষয়ের যে কোন একখানা বই খুঁজ্‌তে যেয়েই মুক্তদ্বার প্রথায় পরিচালিত গ্রন্থাগারে, আরও অনেক বইয়ের খোঁজ পেয়ে থাকেন। এই খোঁজ নিজের চেষ্টায় পাওয়া ব'লে পাঠকের কাছে এর মূল্য আরও বেশী হ'য়ে থাকে।

(৪) পৃথক্ প্রদর্শনের সাহায্যে প্রচার—কোন কোন বইকে তাদের স্বাভাবিক জায়গার থেকে আলদা ক'রে চোখে পড়্‌বার মত জায়গায় এনে রেখে যে প্রচার করা হয় তা' এই জাতীয় প্রচারের মধ্যে পড়ে। এ সব বইগুলো যদি তখন তখনই বাড়ীতে প'ড়্‌তে দেওয়া না যায় তা'হ'লে এই প্রচারের প্রভাব লুপ্ত হ'য়ে যায়। অথচ প্রথম যে চাইল তাকেই বই দিয়ে দিলে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী বইগুলোকে আলাদা করা হ'য়েছিল সেই পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'য়ে যায়। মোটামুটি কোন সমস্যা বা বিষয় সম্বন্ধে সাধারণের মনে জান্‌বার আগ্রহ জন্মালে তবেই এই জাতীয় প্রচারে ফল দিতে পারে। যে বইয়ের প্রচার করা হবে তার অন্ততঃ তিনখানা প্রতিলিপি থাক্‌লে সুবিধা হয়। একখানা প্রচার-স্থানে রেখে দেওয়া হবে, একখানা পাঠকক্ষে ব্যবহারের জন্য রক্ষিত থাক্‌বে, আর একখানা বাড়ীতে পড়্‌তে দেওয়া যাবে। তিনখানা না থাক্‌লেও অন্ততঃ দু'খানার কম প্রতিলিপি নিয়ে এ জাতীয় প্রচার সফল হওয়া কঠিন।

(৫) গ্রন্থের স্থান পরিবর্তনের দ্বারা প্রচার—সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে বইগুলো যে রকমভাবে রাখা হয়, তার থেকে বই রাখার ব্যবস্থার একটু

পরিবর্তন কর্‌লে অনেক নতুন বই চোখের সাম্‌নে এসে পড়ে এবং তার ফলে পড়্‌বার আগ্রহও সৃষ্টি হয়। তাই ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পুস্তাকাধার-গুলোকে মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে রাখার নিয়ম ভাল। কিন্তু খুব বড় গ্রন্থাগারের পক্ষে এই-ভাবে প্রচার করা খুবই অসুবিধাজনক।

(৬) আলোচ্য বিষয়ের বিজ্ঞাপন সাহায্যে কোষগ্রন্থের প্রচার—কোষ-গ্রন্থগুলো নানাবিধ জ্ঞানের আকর। আমাদের অধিকাংশ প্রশ্নের সমাধান ক'রে কৌতূহল নিবারণ করবার উপাদান এতে প্রচুর সংগৃহীত থাকে—অথচ হাতের সাম্‌নে এ সব গ্রন্থ থাক্‌তেও আমরা অনেক সময় এদের ব্যবহার জানি না। তাই গ্রন্থাগারের পক্ষে কোষগ্রন্থের প্রচার করার আবশ্যকতা ও সার্থকতা খুবই আছে।

গ্রন্থাগার ও পুস্তকের প্রচার সম্বন্ধে উপরে যে আলোচনা করা হ'ল তার ক্ষেত্র অনেকখানি সঙ্কুচিত। সাধারণ গ্রন্থের প্রচার বা গ্রন্থাগারের বিজ্ঞাপন ছাড়াও সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিদের জন্য অন্যবিধ প্রচার-পত্রের স্পষ্টতঃ প্রয়োজন আছে। সাধারণ পাঠককেও অনেক সময় নতুন নতুন বিষয় প্রচারপত্রাদির সাহায্যে জানানোর দরকার হয়। সেই জন্য গ্রন্থাগারের দেওয়ালে, বারান্দায়, বহিরলিন্দে প্রচার-পত্রাদি সাজিয়ে দেওয়া হয়। বহিরলিন্দে সুদৃশ্য ও আকর্ষক পুস্তকাদি রেখে পাঠক ব্যতীত অন্যদেরও সরাসরি পুস্তকপাঠে আগ্রহ জন্মানো এই জাতীয় প্রচারের অতিরিক্ত উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগারের প্রচারপত্র নির্মাণ করবার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে :—

(১) প্রচারপত্রে লিখিত অক্ষরগুলো বড় ও সুন্দর হওয়া চাই।

(২) যতদূর সম্ভব প্রাসঙ্গিক ও অর্থদ্যোতক চিত্রের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়কে পরিস্ফুট কর্‌তে পার্‌লে ভাল হয়।

(৩) একটি প্রচারপত্রে একসঙ্গে একাধিক বিষয়ের অবতারণা করা উচিত নয়।

(৪) সহজভাবে দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বক্তব্যটি বলা ভাল। যতদূর সম্ভব অনুজ্ঞা ব্যবহার না করা উচিত।

(৬) বিশেষ বিশেষ পাঠককে মনে রেখে তাদের উপযোগিভাবে প্রচার-পত্র নির্মাণ করা উচিত। সকলের উপকারক পত্র নির্মাণের চেষ্টা করলে সেই পত্র কারুরই উপকার করতে পারবে না।

(৭) প্রচার-পত্রে হাস্যরসের অবতারণা করা উচিত নয়। কেন না, দর্শক ঠিকভাবে সেটা গ্রহণ করতে না পারলে সমস্ত প্রচার-পত্রটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে। চেষ্টা ক'রেও হাস্যরস সৃষ্টি করতে না পারায় প্রচার-পত্র-নির্মাতা নিজেও উপহাসাস্পদ হবেন। আবার যদি হাস্যরস সৃষ্টিতে প্রচার-পত্রনির্মাতা সফল হন তা' হ'লে তাঁর বক্তব্য বিষয়ের চেয়ে বলার ভঙ্গীর দিকেই দর্শকসাধারণের দৃষ্টি যাবে।

প্রচারের রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে যে মন্তব্য করা গেল লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের পক্ষে সেগুলো ভেবে দেখা একান্ত প্রয়োজন। অধিকসংখ্যক পাঠককে জ্ঞানদানের যে ব্রত লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার গ্রহণ ক'রেছে তাকে সফল করবার জন্য প্রচারের কোন না কোন পথ অবলম্বন করা দরকার একথা অবিসম্বাদিত ভাবে সত্য।

দিল্লী সাধারণ গ্রন্থাগার পরিকল্পনা

লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারের রীতি-প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে আমাদের দেশে কোন সঠিক সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। অথচ ভারতের মত জনবহুল দেশের শিক্ষাসমস্যার সমাধান কর্‌তে গ্রন্থাগার যে অনেক সাহায্য কর্‌তে পারে এ বিষয়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিশ্বাস ছিল। তাই ১৯৪৯ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষা-বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সংস্থা যখন স্থির ক'র্‌লেন তাঁদের কোন সদস্য-রাষ্ট্রের এলাকায় একটা আদর্শ গ্রন্থাগার স্থাপন কর্‌বেন, তখন ভারতবর্ষ আগ্রহ ক'রেই সংস্থাকে এই দেশে গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য নিমন্ত্রণ ক'র্‌ল। তদনুসারে ১৯৪৯ সালের নভেম্বর মাসে সংস্থার পক্ষ থেকে মিঃ পিটার্সন দিল্লীতে এসে ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে গ্রন্থাগার-স্থাপনের সর্তাবলী ঠিক্ ক'রে গেলেন। ভারতে গ্রন্থাগার স্থাপন করার সিদ্ধান্ত ঠিক্ হবার পর নির্বাচিত গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীদেশরাজ কালিয়াকে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠান হোল আর ১৯৫০ সালের নভেম্বরে উপদেশক অধ্যক্ষ হিসাবে মিঃ সিড্‌নি গ্রন্থাগারটি গ'ড়ে তোলার ভার নিয়ে এদেশে এলেন।

নানাবিধ অসুবিধার মধ্য দিয়ে দিল্লীতে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ এগুতে লাগ্‌ল। দিল্লীর ডাল্‌মিয়া জৈন হাউস্‌টি পাওয়া গেল গ্রন্থাগারের জন্য। রেলষ্টেশনের অতি নিকটে যাতায়াতের সব রকম সুবিধাযুক্ত জায়গায় পুরানো দিল্লীতে এই বাড়ীটি অবস্থিত। এই বাড়ীর প্রায় ১৫০০০ বর্গফুটের মত জায়গায় আজ দিল্লীর আদর্শ গ্রন্থাগারটি আপনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

দিল্লীর এই গ্রন্থাগারটিকে একটা সাধারণ ভাল গ্রন্থাগার মাত্র মনে ক'র্‌লে ভুল হবে। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা-

বিজ্ঞান-সংস্কৃতি-সংস্থার সঙ্গে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, তাতে স্পষ্টতঃ লেখা ছিল যে দিল্লীতে যে আদর্শ গ্রন্থাগারটি স্থাপিত হ'তে চ'লেছে তা' শুধু যে দিল্লী এলাকায় সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ ক'র্বে তা' নয়, পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এবং ভারতেরও অন্যান্য অঞ্চলের পক্ষে তা' হবে সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ। সুতরাং ভারতের সব অঞ্চলের লোকই ১৯৫১ সালের ২৭শে অক্টোবর তারিখে এই গ্রন্থাগারের দ্বার উদ্ঘাটন হওয়ার পর থেকেই যে এর গতি ও পরিবৃদ্ধি লক্ষ্য ক'র্ছে এটা খুবই স্বাভাবিক।

নাগরিক হিসাবে প্রত্যেকেরই গ্রন্থাগার ব্যবহার ক'র্তে পারার অধিকার আছে, এই স্বীকৃতিই হ'চ্ছে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্তি। অথচ বিশেষ ক'রে গ্রন্থাগার পাবার জন্য যতক্ষণ আমরা সরকারকে কিছু কিছু রাজস্ব না দি', ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রন্থাগার পাবার আমাদের নৈতিক অধিকার জন্মায় না। বস্তুতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার মানে সেই রকম প্রতিষ্ঠান, (১) যার ব্যয় সঙ্কুলান করা হয় রাজস্ব থেকে, (২) যেখানে অধিকার পাবার জন্য নাগরিক হওয়া ছাড়া অন্য যোগ্যতার প্রয়োজন হয় না, (৩) যার লক্ষ্য বইগুলোকে জিইয়ে রাখা নয়, ব্যবহার করার সুযোগ দেওয়া, (৪) যেখানে গ্রন্থাগারগুলোর ভেতরে পর্যন্ত পাঠকদের অবাধ প্রবেশ-অধিকার থাকে। আমাদের দেশে বর্তমান গ্রন্থাগারগুলোতে এই চারটের কোন নীতিই মেনে চলা হয় না। শিক্ষিতদের সংখ্যা এত কম যে গ্রন্থাগারের জন্য কর বসানোর প্রস্তাবে সমর্থন পাবার আশা করা এখন বাতুলতা। সুতরাং দিল্লীতে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করাই সোজা কথা নয়—আদর্শ সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা তো আরও অনেক কঠিন।

তবুও আইন ক'রে কর না বসিয়েও দিল্লীতে সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা গেছে। এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ৬০,০০০ ডলার (মোটামুটি ৩ লক্ষ টাকা) এবং ভারত সরকার ১,২০,০০০

ডলার (মোটামুটি ৬ লক্ষ টাকা) দিয়েছেন—দিল্লী পৌরপ্রতিষ্ঠান দিয়েছে ৫০০০ ডলার (মোটামুটি ২৫,০০০টাকা)। ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাগারের ব্যয় এই টাকা থেকেই নির্বাহ করা হ'য়েছে। এই সময়ের পর আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ শেষ হ'য়ে গেছে আর নতুন ক'রে গ্রন্থাগারের আর্থিক ব্যাপারে বন্দোবস্ত করা হ'চ্ছে।

দিল্লীর এই গ্রন্থাগার পরিকল্পনাকে সার্থক করবার জন্য ভারত সরকার, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও দিল্লীর স্থানীয় পরিচালক-মণ্ডলী প্রগাঢ় সহযোগিতা ক'রেছেন। এই গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য যে সমিতি গঠিত হ'য়েছে, তার সভাপতি ভারত সরকারের মনোনীত, আর সহকারী সভাপতি মনোনয়ন করেন আন্তর্জাতিক সংস্থা। তা' ছাড়া ভারত সরকারের শিক্ষা-বিভাগের একজন, অর্থবিভাগের একজন, পুরানো দিল্লীর পৌরসভার একজন, নতুন দিল্লীর পৌরসভার একজন, দিল্লীর চিফ্ কমিশনারের একজন, দিল্লীর জিলা বোর্ডের একজন, ও আন্তর্জাতিক সংস্থার একজন, মোট সাতজন প্রতিনিধি এই সমিতিতে থাকেন। এছাড়াও তিনজন বিশেষজ্ঞকে সমিতির অন্তর্ভুক্ত ক'রে নেওয়া হয়। এই ১২ জনের সমিতি মোটামুটি গ্রন্থাগার পরিচালনের দায়িত্ব বহন ক'রে থাকেন।

এর উপর আন্তর্জাতিক সংস্থা একজন ক'রে উপদেশক সরবরাহ ক'রে এই গ্রন্থাগার পরিচালনাকে সফল ক'রেছেন। প্রথম উপদেশক মিঃ সিড্নি ১৯৫০ সালের নভেম্বর থেকে আট মাস কাল দিল্লীতে কাটিয়ে এই গ্রন্থাগারকে গ'ড়ে তোলার যাবতীয় কাজ সম্পন্ন করেন। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাস থেকে আট মাসের জন্য আসেন পরবর্তী উপদেশক মিঃ গার্ডনার। আমাদের দেশের গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠায় সাধারণতঃ একটা ভুল করা হয়। গ্রন্থাগারের দ্বার জনসাধারণের নিকট উন্মুক্ত হবার আগে প্রায়ই উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক নিযুক্ত করা হয় না—এর পরিকল্পনা নির্মাণ করেন অন্যেরা যাঁদের হয়ত খুব বেশী বৃত্তিবিষয়ক অভিজ্ঞতা

বা দক্ষতা নেই। সুখের বিষয় আন্তর্জাতিক সংস্থার উপদেশক অধ্যক্ষ প্রেরণের ফলে দিল্লীর ক্ষেত্রে এই ক্রটি ঘট্‌তে পারে নি। এই ক্রটি এখানে ঘট্‌লে তার ফল হ'ত খুবই শোচনীয়। কেননা অন্য দেশে ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছ থেকেও গ্রন্থাগার গঠনে যে সাহায্য পাওয়া যায়-আমাদের দেশে তা এখনও অলভ্য। বস্তুতঃ আমাদের দেশে আসবাবপত্র সংগ্রহ থেকে বর্গীকরণ স্থচীকরণ পর্যন্ত সব কাজেই এত বেশী বিবেচনা করার দরকার, এত পুঙ্খানুপুঙ্খ উপদেশ দেওয়া দরকার, যে খুব অভিজ্ঞ লোক ছাড়া আর কেউই এ কাজ ক'র্‌তে পারেন না।

দিল্লী গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার দিন এর তিন্‌টে বিভাগ ছিল—(১) সাধারণ লেনদেন ও গবেষণা বিভাগ, (২) শিশুবিভাগ এবং (৩) সমাজশিক্ষা বিভাগ। সাধারণ লেনদেন বিভাগের কাজে যে সাফল্য পাওয়া গেছে তা' আশাতীত ব'ল্‌লেও ভুল হবে না। মুক্তদ্বার প্রথায় গ্রন্থাগার চালাতে গেলে কিংবা টাকা গচ্ছিত না রেখে সকলকে সভ্য ব'লে মেনে নিলে গ্রন্থাগারের প্রচুর ক্ষতি হবে ব'লে যে আশঙ্কা করা গিয়েছিল কার্য ক্ষেত্রে তা' একেবারে ভুল প্রতিপন্ন হ'য়েছে। আমাদের নাগরিক কর্তব্যবোধের ন্যূনতার সম্বন্ধে যে সব কথা ব'লা হ'ত, দিল্লীর নাগরিকেরা তাঁদের ব্যবহারের দ্বারা তার অসারতা নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। বস্তুতঃ ট্যাক্সের রসিদ দেখাতে পার্‌লেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের অধিকার পাওয়া যাবে এইটুকু বাঁধনও দিল্লীর গ্রন্থাগার থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। একজন ট্যাক্সদাতার জামিন নিয়ে অ-ট্যাক্সদাতাকে এই অধিকার দেওয়া হ'য়েছে। শিক্ষক, কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক কিংবা প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সুপারিশ ক'র্‌লে জামিন না নিয়েও সাধারণকে সভ্য করা হ'য়েছে। কিংবা এই সব প্রমাণপত্রের কোনটাই জোগাড় ক'র্‌তে না পার্‌লেও ১০৲ গচ্ছিত রেখেই গ্রন্থাগার ব্যবহারের

অধিকার পাওয়া গেছে। ফল কথা, গ্রন্থাগারের বইগুলোর ক্ষতির অমূলক আশঙ্কায় সভ্যসংখ্যা সঙ্কোচনের কোন রকম অজুহাতই দিল্লীতে রাখা হয় নি'। ফলে এই নিঃশুল্ক প্রগতিশীল গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা খুব দ্রুতবেগে বেড়ে অচিরকাল মধ্যে ২১,৫০০তে যেয়ে পৌঁছায়। অবশ্য এর সবটাই মূল গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা নয়। এর মধ্যে মূল গ্রন্থাগারের সভ্যসংখ্যা হবে ১৮,৫০০, ভ্রাম্যমাণ বিভাগের সভ্যসংখ্যা হ'চ্ছে ২,২০০ এবং পুস্তকবিতরণ-কেন্দ্রের সভ্যসংখ্যা হ'চ্ছে ৮০০। অথচ এই বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকদের কাছে ধার দেওয়া ৫,৭৭,০০০ গ্রন্থের মধ্যে মাত্র ৬৫ খানাই যথাযথভাবে প্রত্যর্পিত হয় নি'। পৃথিবীর যে কোন দেশের যে কোন গ্রন্থাগারের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে এ সংখ্যাগুলোর জন্য নিশ্চয়ই আমাদের লজ্জিত হ'তে হবে না।

গ্রন্থাগার কক্ষে ব'সে, বই ও সাময়িক পত্রিকা পড়্‌বার ব্যবস্থাও আছে। তবে এ ব্যবস্থায় লক্ষ্য করার মত তেমন বৈশিষ্ট্য কিছু নেই। বস্তুতঃ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় বা জাতীয় গ্রন্থাগারের গবেষণা-বিভাগের থেকে এ বন্দোবস্তে উল্লেখযোগ্য বিশেষ পার্থক্য নেই।

দিল্লী গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগটি মনোরম। সত্য কথা ব'ল্‌তে গেলে সাধারণ লেনদেনের ক্ষেত্রে দিল্লী-গ্রন্থাগার যে যুগান্তকারী আদর্শের সৃষ্টি করেছে, শিশুবিভাগের ক্ষেত্রেও তার অনুবর্তন করা হ'য়েছে। আমাদের দেশে সুপরিচালিত শিশু-গ্রন্থাগার নেই ব'ল্‌লেই হয়। ছোটদের জন্য বই ব'ল্‌তে ত' একমাত্র স্কুলপাঠ্য বই বুঝায়। তাই এই পরিবেশে দিল্লী গ্রন্থাগার শিশুদের জন্য যা' ক'রেছে তা' আমাদের সকলেরই অনুধাবন ও অনুসরণের যোগ্য। প্রথম প্রথম বইয়ের অভাবে শিশুদের বাড়ীতে বইই দেওয়া যায় নি'। তার পরে এই বইয়ের অভাব মেটাবার জন্য চিত্রবহুল ইংরাজী বইগুলোর উপর ইংরাজীর কাছে স্পষ্ট ক'রে হিন্দী বা উর্দু অনুবাদ লিখে নতুন পাঠ্য বই সৃষ্টি করা হ'য়েছে। এভাবে অবশ্য খুব

কম বইই কাজে লাগানো যায়। যে সব বইতে ছবিই প্রধান, খালি সেই সব বইই, এই ভাবে ব্যবহৃত হ'তে পারে। তবুও ছোটদের বইয়ের অধিকাংশই চিত্রবহুল হওয়া উচিত ব'লে এইভাবে সমস্যার যে অনেকখানি সমাধান হ'য়েছে, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ছোটদের বইয়ের ক্ষেত্রে এই নতুন প্রচেষ্টা ছাড়া দিল্লী গ্রন্থাগারের শিশুবিভাগ সম্বন্ধে আর একটা কথা বিশেষ ক'রে ব'ল্তে হয়। সেটা হ'চ্ছে—এই গ্রন্থাগারটা যে শিশুদের নিজেদেরই প্রতিষ্ঠান, এই কথাটা শিশুদের বুঝিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। এই বিভাগে প্রচার-ফলক আর টেবিল সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে, ছোটরা নিজেরাই নিজেদের আঁকা ছবি দিয়ে এইগুলোকে সাজিয়ে রাখে। এখানে ছোটদের জন্য সপ্তাহে একদিন গল্প বলার এবং দুদিন সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা আছে। ছোটদের নিজেদেরই লিখিত বই অভিনয় করার বন্দোবস্ত আছে। মোট কথা ছোটদের জন্য, ছোটদের পরিচালনায় ছোটদেরই বহুবিধ অনুষ্ঠানের বন্দোবস্ত রেখে এই বিভাগটাকে গ'ড়ে তোলা হ'য়েছে। বলা বাহুল্য, এতে খুব সুফল পাওয়া গেছে।

স্কুলের সঙ্গে যতটা সহযোগিতা করার সাধ এই গ্রন্থাগারের আছে, তার সাধ্য তার চেয়ে অনেক কম হওয়ায়, এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি'। ভ্রাম্যমাণ বিভাগ স্কুলে স্কুলে যেয়ে ছেলেদের গ্রন্থ সরবরাহ ক'র্বে ব'লে কথা হ'য়েছে বটে, কিন্তু সরকারী স্কুলের বাইরে অন্যত্র যাওয়া এর পক্ষে শীগ্গির সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

তবে শিশুদের উপযুক্ত গ্রন্থের তালিকা পাঠিয়ে দেওয়া বা জিজ্ঞাসু শিক্ষকদের গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ার মত কাজ দিল্লী গ্রন্থাগার আগ্রহের সঙ্গেই ক'রে থাকে।

দিল্লী গ্রন্থাগারের সমাজ-শিক্ষা-বিভাগের কাজ অনেকখানি জটিল। এই বিভাগ মূলতঃ সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিদের অক্ষরজ্ঞান বজায় রাখার ও

প্রয়োজনীয় সংবাদ জানার সাহায্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত। কিন্তু তাদের গ্রন্থাগারে আকর্ষণ ক'রে আনা খুব সহজ কথা নয়। এ বিষয়ে নানাবিধ পরীক্ষা করার পর গ্রন্থাগারের উদ্যোগে ছ'টা আলাদা আলাদা সমিতি গঠন করা হ'য়েছে। এই সমিতির প্রত্যেকটি এক এক বিষয়ের কাজ করবার জন্য দায়ী থাকবে। এইভাবে গঠিত হ'য়েছে, অভিনয়-সমিতি, আলোচনা-সমিতি, সাহিত্য-সমিতি, বৃদ্ধদের সমিতি, শিল্প ও কারুকলা সমিতি এবং সঙ্গীত-সমিতি। এই সব সমিতির মারফতে গ্রন্থাগার সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিদের আকর্ষণ করার কাজে অনেকখানি সফল হ'য়েছে। এই সব সমিতিও নিজের নিজের কাজ যতদূর সম্ভব ক'রে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আপাত-অপ্রাসঙ্গিক কাজে আত্মনিয়োগ করা যে অন্যায় নয়, দিল্লী-গ্রন্থাগারের সদ্যঃসাক্ষরদের সেবায় কথঞ্চিৎ সাফল্যলাভে সে কথা প্রমাণিত হ'য়েছে।

সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিদের সেবার কাজে প্রধান কয়েকটা অসুবিধা আছে। একথা সত্য, প্রচার-পত্র, সিনেমা প্রভৃতি যাতে খুব কম কথা বড় ক'রে লেখা থাকে, সেগুলোর অনেকখানিই সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিরা সহজেই বুঝতে পারে। কিন্তু এই বোঝার আর ছাপান বই পড়ার যোগ্যতার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। এই ব্যবধান দূর করা একটা মস্ত কথা। গ্রন্থাগারের এ বিষয়ে স্বার্থ আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু দায়িত্ব নেবার সাধ্য কতটা আছে সন্দেহজনক।

তার উপর বইয়ের অভাব এখানে আরও বেশী সাংঘাতিক। প্রথম পাঠ্য বই খুব খুঁজলে বিভিন্ন বিষয়ে দু'একখানা পাওয়া যায়। তা' হয়ত সদ্যঃসাক্ষর ব্যক্তিদের হাতেও দেওয়া যায়। খুব উচ্চ মানের বইও কদাচিৎ এক আধখানা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ত' আর ঐ শ্রেণীর পাঠকদের দেওয়া যায় না। তাই প্রথম পাঠ্য বই আর উচ্চ মানের বইয়ের মধ্যবর্তী বই যা বড়দের মত ক'রে লেখা হবে, তা' দরকার। কিন্তু এমন বই আমাদের দেশে মোটেই নেই।

এই অসুবিধাটুকু উপলব্ধি মাত্র না ক'রে দিল্লী গ্রন্থাগারের পরিচালক-সমিতি ১৯৫১ সালেই একটা উপসমিতি গঠন ক'রে তাদের উপর উপযুক্ত-পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ভার অর্পণ করেন। ৪০,০০০ টাকা এই কাজের জন্য উপসমিতিকে দেওয়া হ'য়েছে। বস্তুতঃ এই উপসমিতির প্রচেষ্টা সফল হ'লে সদ্যঃসাক্ষরদের সেবা করার কাজে গ্রন্থাগারের এক দুরতিক্রম্য বাধা অপসারিত হবে।

এই তিনটে প্রধান বিভাগ ছাড়াও দিল্লী গ্রন্থাগারের অধীনে একটা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার-বিভাগ আছে। এই বিভাগের প্রায় ৩০০০ বই মোটর-বাহিত হ'য়ে দূরবর্তী অঞ্চলের পাঠকদের মধ্যে সরাসরি বিতরিত হয়। তা' ছাড়া গোটা চারেক পুস্তক-বিতরণ-কেন্দ্রও এর অন্তর্ভুক্ত। এই সব কেন্দ্রে গ্রন্থাগার থেকে বই সরবরাহ করা হয় আর কেন্দ্রের কর্মীরা সেই সব বই স্থানীয় পাঠকদের মধ্যে বিতরণ ক'রে থাকেন।

দিল্লী গ্রন্থাগারে কর্মীদের গ্রন্থাগার-পরিচালনা-বিজ্ঞান শিক্ষা দেবারও বন্দোবস্ত আছে। পাঠকদের পাঠ্য-নির্বাচনে সাহায্য করবার জন্য এর একটা বিশেষ বিভাগ আছে।

কিন্তু ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরেই আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে ভারত-সরকারের চুক্তি শেষ হ'য়ে যাওয়ায় দিল্লী-গ্রন্থাগার এখন তার আন্তর্জাতিক গুরুত্বের অনেকখানি হারিয়েছে। হয়ত সংস্থা কিংবা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান এখনও কিছুকাল একে কিছুটা অর্থ সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা ঠিক এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নয়। দিল্লী-গ্রন্থাগারের পরিবৃদ্ধি সারা দেশ উৎসাহ-ভরে লক্ষ্য ক'রে চ'লেছে। একে বাঁচিয়ে রেখে বাড়িয়ে তুলতেই হবে। সেই প্রচেষ্টা ক'রতে যেয়ে যদি গ্রন্থাগার-আইন বিধিবদ্ধ ক'রতে হয় তবে লোকশিক্ষার বাহন প্রকৃত সাধারণ গ্রন্থাগার গঠনের আন্দোলনে এক নব যুগের সূচনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন ও গ্রন্থাগার-বিষয়ক সরকারী পরিকল্পনা

দিল্লী পরিকল্পনা প্রবর্তনের ফলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে লোক-শিক্ষার বাহন সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা কর্‌বার এক নতুন প্রেরণা দেখা দিয়েছে। বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় প্রত্যেক রাজ্য সরকারই আপন আপন এলাকায় গ্রন্থাগার গঠনের ব্যবস্থা ক'র্‌ছেন। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায়ই সরকারী তহবিল থেকে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হ'য়েছে। সরকারী প্রচেষ্টা এ বিষয়ে যতই কার্যকারী হোক্ না কেন জনসাধারণ অনুকূল এবং সহযোগিতাশালী না হ'লে এতে পরিপূর্ণ সুফল পাওয়া যেতে পারে না। সুখের বিষয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝার ব্যাপারে আজ আর কাউকে নতুন ক'রে কিছু শেখাতে হয় না। জনমত আজ সর্বত্রই অনুকূল—প্রয়োজন শুধু তাকে সংঘবদ্ধ ও একমুখী ক'রে তোলা।

গ্রন্থাগার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য প্রতিষ্ঠান তৈরী কর্‌বার প্রয়োজন, ভারতের অন্যত্র যতই থাকুক না কেন, বাংলা, বরোদা ও মাদ্রাজে ছিল না। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার-সেবী ও গ্রন্থাগার-অনুরাগীরা অনেক দিন আগে থেকেই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ গঠন ক'রে গ্রন্থাগারকে বাড়িয়ে তোলার ও এর বিবিধ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা ক'র্‌ছেন। বাংলা দেশের গ্রন্থাগারের অনেকগুলিই আদর্শবাদী যুবকদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত। এদের অধিকাংশেরই পেছনে সরকারী সাহায্য বা অন্যবিধ নিয়মিত অর্থাগম-ব্যবস্থা সেদিন পর্যন্ত ছিল না,

অথচ এর প্রতিষ্ঠাতাদের প্রাণের সাধ ছিল এই সব প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় লোকশিক্ষার বাহনে পরিণত করার। সুতরাং সুদক্ষ কর্মীর একান্ত প্রয়োজন ছিল এই গ্রন্থাগারগুলোকে গঠন কর্‌বার জন্য। অথচ তদানীন্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বা বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদত্ত শিক্ষা বহুর পক্ষেই গ্রহণ করা সম্ভব হ'ত না বা হয় না। এই সমস্যার সমাধান কর্‌বার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌ তার গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে। এই বিভাগের শিক্ষিত ছাত্রেরা দেশ-সেবার এই গুরুতর দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন ক'র্‌ছে—সমস্ত ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গ্রন্থাগারে দায়িত্বপূর্ণ পদের কাজ চালাচ্ছে। বস্তুতঃ এই শিক্ষার চাহিদা এত বেড়ে গেছে যে একাধিক ক্লাসের ব্যবস্থা ক'রেও সমস্ত শিক্ষার্থী কর্মীকে আজ গ্রহণ করা সম্ভব হ'চ্ছে না। পশ্চিম বঙ্গের বহির্ভূত বিভিন্ন রাজ্য থেকেও এখানে প্রতি-বৎসর শিক্ষার্থী এসে থাকেন। এতেই এই শিক্ষার প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুভূত হবে।

এই ব্যবস্থা ছাড়াও, জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার পরিচালনায় দক্ষতা অর্জনের যে নতুন আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, তাকে ফলপ্রসূ ক'রে তোল্‌বার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌ অত্যল্পকালের মধ্যে কর্মীদের শিক্ষিত ক'রে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে যেয়ে স্বল্পকালীন শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত ক'র্‌ছে। এই ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় ও সার্থক হ'য়েছে।

কুশল কর্মী সৃষ্টি করা ছাড়া, গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের ও গ্রন্থাগার-পরিচালনার নানা সমস্যা আলোচনার সুবিধার জন্য বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌ "গ্রন্থাগার" নামে একখানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ ক'রে থাকে। এই পত্রিকা সভ্যদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হওয়ায় গ্রন্থাগার-বিষয়ক উপদেশ পাওয়া পশ্চিম বঙ্গের সব গ্রন্থাগারের পক্ষেই

অতি সহজ হ'য়ে উঠেছে। গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান মুখ্যতঃ পাশ্চাত্ত্য দেশেই গ'ড়ে উঠেছে। অর্থ-সম্পদে ওদেশ আমাদের চেয়ে বহুগুণে সম্পন্ন। ওদের দেশের থেকে আমাদের দেশের নানা বিষয়েই পার্থক্য আছে। তাই আমাদের দেশের মতন ক'রে গ্রন্থাগার-পরিচালন-ব্যবস্থা কেমন ক'রে গ'ড়ে তোলা যায় তা' নির্ণয় করা নিশ্চয়ই বিবেচনা ও আলোচনা সাপেক্ষ। সুতরাং "গ্রন্থাগার" পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার ক'র্‌বেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্ প্রত্যেক গ্রন্থাগারের নিজস্ব সমস্যা ও প্রশ্ন সমাধানেও সাহায্য ক'রে থাকেন। লোকশিক্ষার সহায়ক উপযুক্ত গ্রন্থের একটা তালিকা প্রকাশ ক'রে সব গ্রন্থাগারকে পুস্তক নির্বাচনে সাহায্য ক'র্‌তে পরিষদ্ প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ। বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের আলোচনা না হ'লে জাতির পক্ষে এতে অধিকার লাভ করা বা সাধারণ লোকের পক্ষে মোটামুটি ধারণা অর্জন করা সহজ হবে না মনে ক'রে এই পরিষদ্ বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনার সাহায্যের জন্য পরিভাষা প্রস্তুত ক'র্‌ছেন। পরিষদের পক্ষ থেকে পরিদর্শক যেয়ে দূর-দূরান্তরের গ্রন্থাগারের সমস্যা উপলব্ধি ক'রে সেগুলোর সমাধানে সাহায্য ক'রে থাকেন। গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারে সহযোগিতা স্থাপনের জন্য, জনসাধারণকে 'গ্রন্থাগার-মনা' ক'রে তোল্‌বার জন্য এই পরিষদ্ প্রভূত চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ বাংলা দেশে গ্রন্থাগার-আন্দোলনের অগ্রগতির জন্য এই প্রতিষ্ঠানকেই প্রধানতঃ ধন্যবাদ দিতে হয়।

কুশল কর্মী সৃষ্টির প্রচেষ্টার জন্য অবশ্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ধন্যবাদার্হ। তবে মনে হয়, এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ইচ্ছা ক'র্‌লে আরও বেশী কিছু ক'র্‌তে পার্‌তেন। মাত্র ডিপ্লোমার জন্য পড়ানোর ব্যবস্থার মধ্যে তাঁদের চেষ্টাকে সীমাবদ্ধ না রেখে তাঁরা যদি ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন ক'র্‌তেন বা গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানে ডক্টরেটের ব্যবস্থা ক'র্‌তেন

তা' হ'লে হয়ত এতদিনে আমাদের দেশেও আমাদের উপযোগী সূচি-ব্যবহার্য বিষয়নাম-তালিকা প্রভৃতি তৈরী হ'তে পারত।

এই সব প্রতিষ্ঠানের চেষ্টায় আমাদের দেশের জনসাধারণ যেমন ক্রমশঃই গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের বিষয়ে অবহিত হ'চ্ছে তেমনই অন্যদিকে সরকারও সমাজ-শিক্ষা ও বয়স্ক-শিক্ষার সফলতার পক্ষে গ্রন্থাগারের সাহায্য অপরিসীম হবে ব'লে মনে ক'রছেন। তাই পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষাখাতে যে বর্ধিত অর্থ বরাদ্দ করা হ'য়েছে, প্রতিরাজ্যের শিক্ষাবিভাগের মারফৎ তার উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রন্থাগার পরিবর্ধনের জন্য ব্যয় করা হ'চ্ছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় বাংলা সরকার এই বিষয়ে যে পরিকল্পনা অনুসরণ ক'রে চ'লেছেন তা' মোটামুটি এইরূপ—

(১) চালু গ্রন্থাগারগুলোকে অর্থ সাহায্য করা এবং গ্রন্থ-বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা, (২) জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করা ও জেলার সমস্ত গ্রন্থাগার-প্রচেষ্টাকে সম্মিলিত করা, (৩) সমাজ-সেবা-বিষয়ক শিক্ষাদান-কেন্দ্রের সন্নিকটে বাণীপুর ও কালিম্পংয়ে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার মালা (Integrated Library System) প্রতিষ্ঠা করা এবং (৪) রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার সহায়ক সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা পাবার জন্য সরকার উন্মুখ হ'য়ে উঠ্‌লেন। যদিও জেলায় জেলায় একজন ক'রে সমাজ-শিক্ষা প্রাধিকারিক নিযুক্ত ক'রে সরকার নিরক্ষরতা-দূরীকরণ, বয়স্ক-শিক্ষা-সম্প্রসারণ আর সমাজ-শিক্ষা-বিস্তারে তাঁদের যে দায়িত্ব আছে তা' প্রতিপালন ক'রতে চেষ্টা ক'রলেন, তবুও এই দেশের বিপুলসংখ্যক নিরক্ষর ও ভাগ্যবিশ্বাসী লোকদের প্রয়োজন মেটানো যে কয়েকজন কর্মচারী মাত্রের উপর নির্ভর ক'রে সম্ভব নয় তা' বুঝ্‌তে তাঁদের একটুও দেরী লাগে নি'। তাই

প্রতি জেলায় সহযোগিতা করতে পারার মত প্রতিষ্ঠানগুলোর খবর সংগ্রহ করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ের পরই তাঁরা ঐ সব প্রতিষ্ঠানকে উৎসাহ দেবার জন্য, ওদের কাজকে ঠিক ধারায় পরিচালিত কর্‌বার জন্য এগিয়ে এলেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগারই আমাদের দেশের দূর-দূরান্তরে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রতিষ্ঠিত একমাত্র সক্রিয় প্রতিষ্ঠান। তাই শিক্ষাবিভাগ এই সব প্রতিষ্ঠানকে অর্থসাহায্য দিয়ে, উপযুক্ত বইয়ের সংবাদ দিয়ে, পরিচালনার সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে সুগঠিত ও আরও কার্যকরী ক'রে তুলতে চাইলেন। এইভাবে সরকার ১৯৫৪-৫৫ আর্থিক বছরে বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার ৬৩৭টি গ্রন্থাগারকে মোট ১০০,০০০ টাকা সাহায্য ক'রেছেন। চালু গ্রন্থাগারগুলোকে এইভাবে অর্থ সাহায্য করলেও সরকারী প্রচেষ্টা এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ঐ গ্রন্থাগারগুলো গ'ড়ে উঠেছিল স্থানীয় কর্মীদের চেষ্টায় স্থানীয় প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। কোন পরিকল্পনা অনুসারে ওগুলোকে গড়া হয় নি'। ফলে হয়ত কোথায়ও কাছাকাছি একাধিক গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠেছে—কোথায়ও বা অনেকখানি পরিধির মধ্যেও একটিও গ্রন্থাগার গ'ড়ে উঠ্‌তে পারে নি'। তাই নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে চালু গ্রন্থাগারগুলো যতই সাহায্য করতে পারুক না কেন, তাদের কাজের অনুপূরণের জন্য সরকারকে জায়গায় জায়গায় কতকগুলো গ্রন্থ-বিতরণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য উৎসাহ দিতে হ'য়েছে। আলোচ্য বৎসরে এইরকম ৪৩৫টি গ্রন্থ-বিতরণ কেন্দ্রে সরকার ৪৫,০০০৲ টাকা সাহায্য ক'রেছেন। খুবই আশা করা যায় এই গ্রন্থ-বিতরণ কেন্দ্রগুলো এখন যে কাজ করছে ভবিষ্যতে আরও বেশী পরিপুষ্ট হ'য়ে তার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করতে পার্‌বে। যাই হোক্ সারা দেশের লোকদের গ্রন্থাগারের সুযোগ পাবার পথে প্রথম সুদৃঢ় পদক্ষেপ যে সরকারী সাহায্যের ফলে ঘ'টেছে এটা আমরা খুবই আশার সঙ্গে মনে ক'রছি।

বস্তুতঃ আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা বেসরকারী প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্ত সমাজের সামান্য কয়েকজন শিক্ষিতের জন্য গ'ড়ে উঠেছিল। সরকার এই ব্যবস্থায় অংশ নিয়ে কথকতা প্রভৃতিকে গ্রন্থাগার প্রচেষ্টার অঙ্গীভূত করায় বৃহত্তর জনসমাজের সঙ্গে এর যোগাযোগের পথ খুলে গেল। সরকার নিছক অবসর বিনোদনের খেয়ালের প্রতিষ্ঠানগুলোকে, লোকশিক্ষার বাহন প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত কর্‌বার নেতৃত্ব গ্রহণ কর্‌লেন।

সাহায্য দেবার জন্য গ্রন্থাগার নির্বাচন ক'র্‌তে যেয়ে সরকারকে স্বভাবতঃই জেলা হিসাবে গ্রন্থাগারগুলোর দাবী বিবেচনা করতে হ'ল। লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগারগুলোর মধ্যে সহযোগিতা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আমরা সবিস্তারে আলোচনা ক'রেছি। সরকারও এই প্রয়োজনীয়তা প্রণিধান কর্‌লেন। ফলে প্রত্যেক জেলার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থায় সহযোগিতা সৃষ্টির জন্য সরকার জেলায় জেলায় গ্রন্থাগার সঙ্ঘ স্থাপন কর্‌লেন। এই সঙ্ঘ পরিচালনার যাবতীয় ব্যয় সরকারী কোষ থেকে সরবরাহ করার বন্দোবস্ত করা হ'ল। তা'ছাড়াও প্রত্যেক সাধারণ জেলায় একটা ক'রে এবং মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা, বর্ধমানের মত বড় জেলায় দুটো ক'রে কেন্দ্রীয় জেলা গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হ'ল। এই গ্রন্থাগারগুলিই প্রকৃত পক্ষে প্রতি জনপদের প্রথম সাধারণ গ্রন্থাগার হবে। সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারগুলোর বিষয়ে কোন নির্দেশ না থাক্‌লেও, এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে যে, একে হ'তে হবে নিঃশুল্ক। লোকশিক্ষার সুবিধার জন্য মহিলা-বিভাগ, শিশু-বিভাগ এবং ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজকে বিশেষ ক'রে এই গ্রন্থাগারে গ্রহণ কর্‌তে হবে এবং সঙ্ঘের অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলোকে যতদূর সম্ভব সাহায্য করতে হবে। প্রতি গ্রন্থাগারের জন্য সরকার যে অর্থ সাহায্য কর্‌ছেন বর্তমান অবস্থায় তাকে অপ্রচুর বলা চলে না। কেন না পরিচালনার পৌনঃ-

ষ্ঠানিক যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করা ছাড়াও শুধু প্রতিষ্ঠার সময়েই সরকার প্রত্যেক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য ব্যয় করবেন—

গৃহনির্মাণ খাতে	— ৭৮০০০ টাকা
পুস্তক	— ১২০০০ টাকা
আসবাবপত্র	— ১৫০০০ টাকা
গ্রন্থযান	— ২৫০০০ টাকা
মোট	—১৩০০০০ টাকা

জিলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের এই পরিকল্পনা ছাড়াও সরকার নিজস্ব পরিচালনায় বোধ হয় মূলতঃ সমাজসেবাব্রতে শিক্ষাকামীদের কাছে আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই বাণীপুর এবং কালিম্পংয়ে একটা একটা ক'রে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারমালা (Integrated Library System) প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। এই দুই জায়গায়ই আছে জনতা কলেজ। এই কলেজে সমাজ উন্নয়নের (Community Development) বিভিন্ন উপায় ও পথের শিক্ষা দিয়ে কর্মী তৈরী করা হয়, যাতে শিক্ষার্থীরা নিজের শিক্ষা পাবার পর নিজের নিজের দেশে ফিরে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন। বলা বাহুল্য, সমাজসেবা শিক্ষার সব রকম ব্যবস্থা ক'রেও যদি জ্ঞান-অর্জনে স্বাধীনতা লাভের পথটি শেখানো না হয়, তা'হ'লে এ শিক্ষা হবে অসম্পূর্ণ। আজও অবশ্য জনতা কলেজের শিক্ষার্থীদের এই গ্রন্থাগারে এসে গ্রন্থাগার পরিচালনা শিখতে বলা হয় নি'; কিন্তু এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারমালার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগার-পরিচালন-বিজ্ঞান শেখানোর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে। তাই মনে হয়, অচিরকালে হয়ত জনতা কলেজের পাঠ্যতালিকায় লোকশিক্ষার বাহন গ্রন্থাগার পরিচালনার মূল কথাগুলো অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

কলেজের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ছেড়ে দিলেও বাণীপুর-কালিম্পংয়ের সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগারের গুরুত্ব যথেষ্ট। জেলায় জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার

পরিচালনা সম্বন্ধে সরকার যে উপদেশই দিন না কেন, সেগুলোর সাফল্য-অসাফল্যের জন্য সরকারকেই শুধুমাত্র দায়ী করা যাবে না। কিন্তু এই দুই গ্রন্থাগার সরকারের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণাধীন ব'লে এর সাফল্যের জন্য সরকার পুরোপুরিই দায়ী হবেন। তা'ছাড়া দিল্লী গ্রন্থাগারকে যেমন সমস্ত ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ মনে ক'রে সারা দেশ এর পরিবৃদ্ধির দিকে উৎসুকভাবে তাকিয়ে ছিল, তেমনই বাণীপুর-কালিম্পংয়ের গ্রন্থাগারও পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের কাছে সাধারণ গ্রন্থাগারের আদর্শ ব'লে জনসাধারণ এদের দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাক্‌বে। কোন ত্রুটির জন্য যদি এই গ্রন্থাগার সাফল্যলাভ কর্‌তে না পারে তা' হ'লে তার কুপ্রভাব সমস্ত জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর পড়্‌বার আশঙ্কা থাক্‌বে।

বাণীপুর-কালিম্পংয়ে অনুসৃত পরিকল্পনার অবশ্য কতকগুলি সুবিধা আছে। প্রথম সুবিধা হ'চ্ছে, এরা কোন ভৌগোলিক সীমার দায়িত্ব স্বীকার কর্‌তে বাধ্য না হওয়ায় এদের পক্ষে নিজেদের সুবিধামত পরিধির মধ্যে কাজ করা সম্ভব হ'য়েছে। সেই পরিধির মধ্যে পাঁচটা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার আর প্রত্যেক আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অধীনস্থ ছয়টা শাখা গ্রন্থাগার গঠন ক'রে একটা নিরূপিত সীমার সমস্ত অধিবাসীকেই গ্রন্থাগারের সুযোগ দেবার চেষ্টা করা হ'চ্ছে। এই ত্রিশটা গ্রন্থাগারের সমন্বয় সাধন করা, তাদের সুপরিচালিত রাখা, সাহায্য করা, অভাব দূরীভূত করা—এ সবই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার-মালার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কাজ। তার উপর আছে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের নিজস্ব লেনদেন বিভাগ, শিশু-বিভাগ, মহিলা-বিভাগ, সন্ধানী বিভাগ (reference section) প্রভৃতি। যারা গ্রন্থাগারে এসে বই নিতে পার্‌বে না, এসব জায়গায় তাদের সংখ্যা নগণ্য হবে না। কেননা এখানে গাড়ীঘোড়ার খুবই অসুবিধা আছে। তাই অচিরভবিষ্যতে এদের অধীনে ভ্রাম্যমাণ বিভাগ স্থাপন কর্‌তে

হবে। তা' ছাড়া পার্শ্ববর্তী জনতা কলেজের ছেলেদের কাছে সমাজ-উন্নয়ন-শিক্ষা প্রসারের আদর্শ প্রতিষ্ঠান হ'য়ে উঠ্‌তে হবে এই গ্রন্থাগার-গুলোকে। বস্তুতঃ জনতা কলেজের ছাত্রেরা সমাজ-উন্নয়ন কাজে নিযুক্ত এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে মাত্র দেখ্‌তে পাবে। সুতরাং সমাজশিক্ষা প্রসারে সাহায্য কর্‌বার জন্য দিল্লী পরিকল্পনায় অভিনয় প্রভৃতি যে সব কার্যক্রম অনুসরণ করা হয়, এখানেও সে সব কর্‌তে হবে। ফল কথা, এই সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার পরিকল্পনাকে সার্থক ক'র্‌তে হ'লে সরকারকে অকৃপণ হাতে এর পেছনে অর্থব্যয় ক'র্‌তে হবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রন্থাগার বন্দোবস্তের প্রথম পরীক্ষা নিরীক্ষার কাজ এই পরিকল্পনায় আরম্ভ হ'য়েছে। উপযুক্ত সংখ্যক যোগ্য কর্মীর অভাবে, অর্থাভাবে কিংবা আনুষঙ্গিক ক্রটির জন্য সরকার এই পরি-কল্পনাকে কিছুতেই ব্যর্থ হ'তে দেবেন না—এই আশা পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যকামীরা সকলেই মনে মনে পোষণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রন্থাগার-বিষয়ক নবতম পরিকল্পনা হ'চ্ছে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনার বিস্তৃত বিবরণ এখনও প্রকাশিত হয় নি'। তবুও এই পরিকল্পনা নির্মাণ যে অনেক দূর অগ্রসর হ'য়েছে এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যে প্রভূত অর্থ বরাদ্দ করেছেন তার সূচনা সংবাদপত্রে পাওয়া গেছে।

উপযুক্তভাবে পরিচালিত হ'লে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিকল্পনা আমাদের দেশে গ্রন্থাগার-ব্যবহারের অপূর্ব সুযোগ এনে দিতে পারে। একদিকে যেমন আমাদের জেলায় জেলায় সমস্ত জেলার গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার আয়োজন করা হ'চ্ছে, অন্যদিকে তেমনই আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার আমাদের দেশের সব উৎপন্ন পুস্তককে একত্র ক'রে বিশাল গবেষণাগার তৈরী ক'র্‌তে চ'লেছে। নতুন গ্রন্থস্বত্ব আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে আমাদের দেশে প্রকাশিত সব গ্রন্থই

জাতীয় গ্রন্থাগারগুলোতে নিশ্চিতভাবে সংগৃহীত হবে। এইভাবে জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকাই আমাদের দেশে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তকের পরিপূর্ণ তালিকা হ'য়ে উঠ্‌বে। কিন্তু জাতীয় গ্রন্থাগারের পুস্তক-সংগ্রহ যত বিপুলই হোক্ না কেন—এর পক্ষে কোন রাজ্য-বিশেষের সমস্ত গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাকে সমন্বিত করা সম্ভব হ'য়ে উঠ্‌বে না। সমস্ত রাজ্যের সব গ্রন্থাগারের একটা একত্রীকৃত সূচী (union catalogue) তৈরী থাক্‌লে রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন এলাকার লোকেদের যে কোন বই পাবার যে সুবিধা হয়, সেই সুবিধার পথ প্রশস্ত কর্‌বার দায়িত্ব কখনই এদেশের জাতীয় গ্রন্থাগারের উপর প'ড়্‌তে পারে না। লোকশিক্ষা-বিস্তারের কাজে কোন ভাষায় কোন বিশেষ বইয়ের অভাব যদি কোন রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলো অনুভব করে তা' হ'লে সেই বই প্রকাশের জন্য যে আয়োজন করা দরকার সে বিষয়েও জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে অতি সুস্পষ্ট কারণে দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়। ফল কথা, দেশের সমস্ত লোককে জ্ঞানের শক্তিতে শক্তিমান্ ক'র্‌তে চাইলে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার ও জেলা গ্রন্থাগারের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূর্ণ ক'র্‌তে হবে—আমাদের স্বতন্ত্র রাজ্য গ্রন্থাগার পরিকল্পনা নির্মাণ ক'র্‌তে হবে। সুখের বিষয়, আমাদের রাজ্য সরকার এই পথে প্রথম পদক্ষেপ ক'রেছেন।

রাজ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হ'লে আমরা আশা কর্‌ব, এর সাহায্যে বাঙ্গালীরা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলো পেতে পার্‌বে—(১) রাজ্যের কেন্দ্র-স্থলে একটা সুপরিচালিত, সুগঠিত ভাল সাধারণ গ্রন্থাগার, (২) বাংলা ভাষায় প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ের সমস্ত পুস্তকের পরিপূর্ণ তালিকা, (৩) রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সমস্ত গ্রন্থাগারের পুস্তক-তালিকা এবং ফলতঃ পাঠকের প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানি কোন্ কোন্ গ্রন্থাগারে আছে সেই খবর, (৪) রাজ্যের যে কোন অঞ্চল থেকে বই ধারে আন্‌বার সাহায্য, (৫) গবেষণার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ও প্রবন্ধের তালিকা নির্মাণে

সাহায্য; (৬) ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে বই কেনা, বর্গ-নির্মাণ, সূচী-নির্মাণ প্রভৃতিতে সাহায্য, এবং (৭) যে সব বিষয়ে বইয়ের অভাব আছে সে সব বিষয়ে বই প্রকাশ করার জন্য সরকারকে উদ্বুদ্ধ ক'র্তে সাহায্য।

ঠিক্ ঠিক্ ভাবে এই সব সাহায্য দিতে হ'লে রাজ্য গ্রন্থাগারের অধীনে সুগঠিত বিভিন্ন বিভাগ থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সাধারণ গ্রন্থাগার হিসাবে একে চালাতে হ'লে সে বিষয়ে নিখুঁত ব্যবস্থা রাখা দরকার—এর জন্য একটা পৃথক্ বিভাগ রাখ্তেই হবে। এই বিভাগের উপর বাড়্তি ভার থাক্বে পাঠকের নানা প্রশ্নের জবাব সংগ্রহ ক'র্তে সাহায্য করার। তার পরে রাজ্যের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থের একত্রীকৃত সূচী রাখা, ছোট ছোট গ্রন্থাগারকে বই কেনা বা গ্রন্থবর্গ নির্মাণে সাহায্য করা এবং পাঠকদের দূরবর্তী গ্রন্থাগার থেকে বই ধারে আনিয়ে দেওয়া—এ সবের জন্য একটা বিভাগ থাকা দরকার। তা'ছাড়া গ্রন্থস্বত্ব আইন অনুসারে নতুন নতুন লেখকেরা গ্রন্থাগারে বই জমা দিল কিনা এটা জাতীয় গ্রন্থাগারের পক্ষে নজর রাখা সম্ভব নয়, এ কাজ প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের করা উচিত। এই কাজের জন্য যে বিভাগ থাক্বে সেই বিভাগই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সমস্ত গ্রন্থের তালিকা নির্মাণ ক'র্তে পার্বে—বিভিন্ন বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের সূচী তৈরী ক'র্বে, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির সহায়তায় গবেষকদের পাঠ্যবিষয়ের তালিকা তৈরী ক'র্তে সাহায্য কর্বে। তা'ছাড়া একটা উপদেশক সমিতির সঙ্গে পরামর্শ ক'রে বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগারের উপযোগী বই ছাপান বিষয়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করাও এই গ্রন্থাগারেরই কাজ হওয়া উচিত। ফল কথা, রাজ্যের সর্বত্র জ্ঞানের আলো যাতে ছড়িয়ে পড়্তে পারে, কোন মানুষের নিবার্য অভাব যেন তার উন্নতির প্রতিবন্ধক না হয়, সে দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত রাজ্য গ্রন্থাগারকেই নিতে হবে। এই গ্রন্থাগার-বিষয়ক বিস্তৃত পরিকল্পনা

প্রকাশিত হবার আশায় সকলে আগ্রহভরে অপেক্ষা ক'রছে। অনতি-বিলম্বে এই পরিকল্পনা প্রকাশ ক'রে একে কার্যে পরিণত করতে অগ্রসর হ'লে সরকার সকলের ধন্যবাদার্হ হবেন।

পূর্বোক্ত কাজগুলির মধ্যে গ্রন্থসূচী-নির্মাণ প্রভৃতি অনেক কাজ অন্যান্য দেশে Wilson Companyর মত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান ক'রে থাকে। আমাদের দেশেও এ বিষয়ে বেসরকারী প্রচেষ্টা যে মাঝে মাঝে দেখা না যায় তা' নয়। কিন্তু তার কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বস্তুতঃ বহু-ভাষাভাষী শিক্ষায় অনগ্রসর এই দেশে কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ কাজ আগ্রহভরে হাতে নেবে—এ আশা করা বৃথা। বেসরকারী কাজের উপর কোন নির্ভর করাও যায় না। কেননা এ জাতীয় কাজ নিয়মিত শৃঙ্খলার সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে করা না হ'লে সে কাজের উপর আস্থা রাখা যায় না। তাই সরকারী প্রচেষ্টায় আরব্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের এ কাজ হবেই না। অবশ্য প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য ক'রে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ্‌ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উপর এই সব কাজের ভার দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কাজটি যথাযথ সম্পন্ন হ'চ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজর রাখার দায়িত্ব রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের উপর থাকা উচিত। মোট কথা, এই সব কাজ সুসম্পন্ন ক'রে লোকশিক্ষার পথকে প্রশস্ত করবার দায়িত্ব সরকারকেই নিতে হবে।

—নির্ঘণ্ট—